শ্রীশ্রীঠাকুরের দৃষ্টিতে দেবদেবী

পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের
পুণ্য জন্মশতবর্ষে
ভক্তি-অর্ঘ্য

শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক ঃ

শ্রীদীপ্তসুন্দর মুখোপাধ্যায়

পোঃ সৎসঙ্গ,

জেঃ দেওঘর, (বিহার)

সৎসঙ্গের সব বইয়ের দোকানে পাওয়া যায়

প্রথম প্রকাশ—২২০০

২০শে শ্রাবণ, ঝুলনযাত্রা, ১৩৯৪ (ইং ৫।৮।৮৭)

প্রকাশক কর্ত্তৃক সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মুদ্রাকর ঃ

বীরা প্রিণ্টার্স

দেওঘর, বিহার

মূল্য—৬ টাকা

Sri Sri Thakurer Drishtite Deb-Debi
by Devi Prasad Mukherjee

Price—Rs. 6

উৎসর্গ

আমার সমস্ত রচনাতেই যাঁর সমান আগ্রহ
সেই পূজনীয়া শ্বশ্রূমাতাকে

দু' এক কথা

পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের নিকটে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেবদেবী সম্পর্কে অনেক আলোচনা হয়েছে। আলোচনার ভিতর দিয়ে দেবতাদের নামকরণ তথা তাঁদের প্রকৃত তত্ত্ব ও তথ্য সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা তিনি এনে দিয়েছেন। তাঁর শ্রীচরণতলে ব'সে সেসব কথা শুনতে শুনতে দেবতা ও দেবলোকাদি সম্বন্ধে একটি সহজ অথচ ঘরোয়া রকমের বোধ মানুষের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দেবতাকে মাটি বা পাথরের প্রতিমা ব'লে মনে হয় নি। মনে হয়েছে তিনি আমাদের ঘরের মানুষ।

সেই দিব্য ভাবের অনুরণন প্রাকৃতজনের লেখনী দিয়ে যথাযথ তুলে ধরা অসম্ভব। তবুও ভাল লাগে সেগুলি ভাবতে, ভাল লাগে সেই দর্শনে সব-কিছু দেখতে, যার মধ্যে ফুলে-ফুলে দুলে-দুলে উঠেছে জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি। লীলাময়ের সেই অমিয় কথনরাজি পর্য্যালোচনা ক'রে তার মাধুর্য্য হৃদয়ঙ্গম করার প্রচেষ্টাতেই এই দুঃসাহসিক লেখনী-চালনা।

আর্য্যহিন্দুশাস্ত্রে দেবতার সংখ্যা সুপ্রচুর—কথিত আছে তেত্রিশ কোটি। প্রত্যেকের আকার, চরিত্র, বাহন স্বতন্ত্র। সবার কথা এখানে আলোচিত হয়নি। কয়েকজন প্রধান দেবতাকে নিয়েই এই পুস্তকের অবতারণা। লেখাগুলি যদি পাঠককুলকে উৎস-সন্ধানী ক'রে বিশ্ববিধাতৃত্বের স্বরূপ-উপলব্ধির পথে প্রেরণা জোগায়, তবেই আসবে এ রচনার সার্থকতা।

সৎসঙ্গ, দেওঘর

৮ই শ্রাবণ, শুক্রবার, ১৩৯৪ — নিবেদক

ইং ২৪।৭।১৯৮৭ — **গ্রন্থকার**

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
নারায়ণ	১
মহাদেব	৩০
দুর্গা	৫৪
লক্ষ্মী	৮৪
সরস্বতী	১০৫
গণেশ	১১৫
কালী	১২৮
দেবায়ন	১৪৫

নারায়ণ

পৃথিবীতে অসংখ্য মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢ'লে পড়ে। যারা বেঁচে থাকে তাদের প্রত্যেকেই জানে যে একদিন তাকেও মরতে হবে। তবুও মানুষ মরণকে এড়াতে চায়। এড়াতে যে চায় তার প্রমাণ হল, পায়ে সামান্য একটা কাঁটা ফুটলে বা দাঁতের গোড়ায় একটু যন্ত্রণা হ'লেই মানুষ অস্থির হ'য়ে ওঠে এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত কাঁটাটি তুলে ফেলতে না পারে বা ঐ যন্ত্রণার উপশম ঘটাতে না পারে, ততক্ষণ সে সোয়াস্তি পায় না। এটা হয় ঐ বাঁচার তথা সুস্থ থাকার কামনা থেকেই।

বাঁচার জন্যই মানুষ স্মরণাতীত কাল থেকে অমৃতের সন্ধান করছে, 'অমৃত অমৃত' ব'লে চীৎকার করছে। আর্য্যঋষি মানুষকে সম্বোধন করেছেন 'অমৃতের পুত্র' বলে।

এই অমৃতের পথ অর্থাৎ মৃত্যুহীনতার পথ তথা বাঁচার পথ যাঁর কাছে পাওয়া যায়, তিনিই নারায়ণ—মানুষের জীবনপথ।

নারায়ণ-শব্দটিকে ভাঙ্গলে দুইটি পদ পাওয়া যায়, নর এবং অয়ন। নর শব্দের উত্তর অণ্ প্রত্যয় ক'রে হয় 'নার', মানে নরসমূহ। আর, অয়ন মানে পথ। তাই, নারায়ণ মানে মানুষের (জীবন)-পথ, যে-পথ অনুসরণ ক'রে চললে মানুষ ভাল থাকবে, সুস্থ, স্বস্থ, সুদীর্ঘ জীবনের অধিকারী হবে।

মনুসংহিতায় আছে, 'নারা' মানে জল (১।১০)। এই জল যাঁর আশ্রয় তিনিই নারায়ণ। স্মৃতির এই উক্তির একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে।

ক্ষিতি (মাটি), অপ্ (জল), তেজ (আগুন), মরুৎ (বাতাস) ও ব্যোম (শূন্য), এই পঞ্চভূত দ্বারা সমগ্র বিশ্বচরাচর সৃষ্টি হয়েছে। তার মধ্যে ব্যোম হ'ল মহাশূন্য, সেখানে আছে শুধু শব্দগুণ। তৎপরবর্ত্তী পদার্থ মরুৎ—রূপরসগন্ধবিহীন ; তাকে অনুভব করতে হয় স্পর্শের ভিতর দিয়ে। তারপর আসছে তেজ (অগ্নি), যার মধ্যে আছে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ-গুণ। কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত সৃষ্টিধারা ঘনীভূত কোন অবস্থায় পর্য্যবসিত হয় নি। তেজ বা অগ্নিতে একটা গ্যাসীয় অবস্থার বিকাশ পর্য্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে।

ঘনীভূত প্রথম পদার্থই হ'ল জল—যার মধ্যে শব্দ-গুণ, স্পর্শগুণ, রূপগুণ ও রসগুণের অস্তিত্ব আছে। এই জলকে আশ্রয় ক'রেই হয়েছে প্রথম প্রাণের উদ্ভব। প্রাণের উৎপত্তির জন্য চাই রস। তাই, মনুসংহিতাতে আবার বলা হয়েছে, জলই প্রথম সৃষ্টি (১৷৮)। জলেই সূচিত হ'ল প্রাণের প্রথম স্পন্দন। এককোষী প্রাণী প্রথম দেখা দিল জলের মধ্যে। তাই, নারায়ণ শব্দের এমনতর ব্যুৎপত্তি।

শতপথব্রাহ্মণে আছে, নারায়ণ প্রথম পুরুষ (১৩৷৬৷২৷১)। তিনি সৃষ্টিকর্তারও স্রষ্টা। নারায়ণের নাভিপদ্ম থেকে ব্রহ্মার জন্ম। ব্রহ্মাই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। তাই, মহামতি ব্যাসদেব সেই প্রথম পুরুষ নারায়ণকে প্রণাম ক'রে শ্রীমদ্‌ভাগবত রচনার কাজে ব্রতী হয়েছেন (১৷২৷৪)।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে আছে, বৈকুণ্ঠে নারায়ণের চতুর্ভুজ মূর্ত্তি। চতুর্ভুজ মানে চার হাত। চার-হাতওয়ালা বিষ্ণুমূর্ত্তি আমরা অনেক জায়গায় পূজিত হ'তে দেখে থাকি। নারায়ণের এই চার হাতের তাৎপর্য্য কী? চার হাত মানে চার দিক দেখে চলা, চারদিকে অর্থাৎ সবদিকে নজর রাখা। বিশ্ব-

দুনিয়ার প্রভু যিনি তাঁর দৃষ্টির বাইরে তো কিছুই নেই।—তিনি সর্ব্বদর্শী।

নারায়ণের চার হাতে আছে শঙ্খ, চক্র, গদা এবং পদ্ম। তাই তিনি 'শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী' নামে অভিহিত হ'য়ে থাকেন। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী নারায়ণের মহিমা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভক্তগণ বলেছেন, শঙ্খধ্বনি দ্বারা তিনি সমগ্র মানবসমাজকে আহ্বান করেন, যুদ্ধার্থে বা কর্ম্মার্থে নিয়োজিত হ'তে প্রবুদ্ধ ক'রে তোলেন। চক্র ও গদা হল যুদ্ধাস্ত্রের প্রতীক, যা' দিয়ে তিনি অন্যায়কারীকে শাস্তি-প্রদান ও নিধন করেন। আর, পদ্ম হ'ল লক্ষী তথা সৌন্দর্য্যের প্রতীক। নারায়ণের করকমলে পদ্ম মানে সেখানে লক্ষীশ্রীর আবাস।

কিন্তু এই শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মের অপূর্ব্ব এক যুক্তি-পূর্ণ সুসমঞ্জস ব্যাখ্যা দান করেছেন পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র। তাঁর কথা থেকে বোঝা যায়, এগুলি নারায়ণের বিভিন্ন শক্তি। আরো উপলব্ধি করা যায় যে, যারা নারায়ণের উপাসনা করে, নারায়ণকে তৃপ্ত ও প্রীত ক'রে চলাই যাদের পরম-পুরুষার্থ, তারা প্রত্যেকেই কমবেশী এইসব

যার ফলে, জন ও জাতি
উৎকর্ষে অবাধ হ'য়ে চলতে পারে
—নিয়ত নির্ব্বিরোধে।" (শাশ্বতী, ২য় খণ্ড)

তারপর আসছে গদা। গদা শব্দটা শুনলেই স্বভাবতঃ আমাদের মনে জেগে ওঠে ভীমের গদার কথা। আর, তা' হ'ল লড়াই করার জন্য এক শ্রেণীর লোহার মুগুর। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে যখন গদার তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা করা হ'ল, তিনি শব্দ-টির ধাতুগত অর্থ দেখতে বললেন। দেখা গেল, গদ্-ধাতু মানে কথন (কথা বলা) এবং মেঘধ্বনি। একথা শুনে দয়াল ঠাকুর বিষ্ণুর হস্তস্থিত গদার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বললেন—

"গদা তোমাকে
গুরুগম্ভীর মেঘবাণীতে বাগ্মী ক'রে তুলুক,
তোমাতে মুগ্ধ হোক সবাই,
পরিপোষণী বিচ্ছুরণে দীপ্ত হোক
তোমার পরিপূরণী প্রকীর্ত্তি,
কৌমোদকী সার্থক ক'রে তুলুক তোমাকে।"

তাহ'লে গদা মানে দেখা যাচ্ছে বাক্য ও কর্ম্মের অমোঘ সুসঙ্গতিপূর্ণ বিন্যাস।

পদ্ম-শব্দস্থিত পদ্‌-ধাতুর মানে আছে গতি, স্থৈর্য্য, প্রাপ্তি। ধাতুগত অর্থের উপর দাঁড়িয়ে পদ্মের কী কাজ তা' বুঝিয়ে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—

"আর পদ্ম আনুক গতি, আনুক স্থৈর্য্য,
প্রাপ্তিতে প্রস্ফুটিত ক'রে তুলুক জন ও জাতিকে।"

সমস্ত কথাগুলি একটু ধীর মস্তিষ্কে গভীরভাবে অনুধাবন করলেই পরিষ্কার বোঝা যায় যে, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম যে একমাত্র নারায়ণের হাতে ছাড়া আর কোথাও থাকতে পারে না তা' নয়। যে-ব্যক্তি নিষ্ঠার সঙ্গে নারায়ণের অর্চ্চনা করে, প্রকৃত বিষ্ণুভক্ত বা বৈষ্ণব যে, তারও চরিত্রে ঐ চতুঃশক্তি সতাৎপর্য্যে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে—যার যার বৈশিষ্ট্যমাফিক।

শ্রীশ্রীঠাকুর একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলছিলেন, "প্রতিটি মানুষই একটি ক্ষুদে ঈশ্বর।" তাই, নারায়ণকে যারা ভালবাসে, তাঁকে অনুসরণ ক'রে যারা চলে, তৎপ্রীত্যর্থেই যাদের জীবন ও কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত হয়, তাদের চলা-বলা-করায় শঙ্খ চক্র-গদা-পদ্মের উপরি-উক্ত ক্রিয়া বিকশিত হ'য়ে ওঠে। তারাও হ'য়ে ওঠে এক-একটি ক্ষুদে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী। চার আল দেখে চলার জন্য তারা হয় চতুরচলনসম্পন্ন।

এইভাবে জীবনে তাদের বিষ্ণুপূজা বা নারায়ণপূজা সার্থক হ'য়ে ওঠে। কারণ, পূজা মানেই হ'ল সংবর্দ্ধনা—যাঁকে পূজা করছি, তাঁর প্রতি অনুরাগ নিয়ে, তাঁর গুণাবলী বিহিত অনুশীলনের ভিতর দিয়ে নিজ চরিত্রে মূর্ত্ত করে তোলা।

তাৎপর্য্য জেনে দেবতার আরাধনা করতে পারলেই তাঁর অন্তঃপুরে গতাগতির একটা সুযোগ হয়, দেবতার সাথে প্রাণের একটা নিবিড় সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। নতুবা, দেবমূর্ত্তির সামনে শুধু কতকগুলি পুঁথিগত শুষ্ক সংস্কৃত মন্ত্র পাঠ ক'রে ফুল-জল দিলে তা' হয় দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে বাড়ীটি দেখে চ'লে আসার মত। জানা হয় না বাড়ীর ভেতরে কতগুলি ঘর, ঘরগুলি কত বড়, আসবাবপত্র কেমন, ইত্যাদি। একেই বলা হয় বাহ্যপূজা। তাতে দেবতার সাথে অন্তরের যোগ স্থাপিত হয় না। ফলে উদ্বর্দ্ধনাও ব্যাহত হয়। মুনিগণ এমনতর পূজাকে বলেছেন অধমেরও অধম।

পুরাণে উল্লিখিত আছে, নারায়ণ অনন্তশয্যায় শায়িত। তাঁর নাভিপদ্ম থেকে ব্রহ্মা জাত হলেন। এই ব্রহ্মা হলেন ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টিকর্ত্তা। এই তথ্যটিকে

এবার আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবানুসরণে বুঝতে চেষ্টা করব।

'নর' শব্দ এসেছে নৃ-ধাতু থেকে, মানে বর্দ্ধন। আর অয়ন মানে পথ। তাই, নারায়ণ মানে শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন 'বর্দ্ধনার পথ'। বিশ্বদুনিয়ায় সৃষ্ট প্রতিটি পদার্থের মধ্যেই আছে অস্তি ও বৃদ্ধির আকূতি —থেকে বেড়ে চলার প্রবণতা। বিরাট নীহারিকা জগৎ থেকে আরম্ভ ক'রে ধূলিকণার অতি ক্ষুদ্র অণু পর্য্যন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় সব কিছুতে এই সম্বেগ অনুস্যূত হ'য়ে আছে। এমন কিছুই নেই যেখানে এই সম্বেগ নেই। তাই, নারায়ণ অনন্ত, তাঁর অন্ত করা যায় না। আর, সর্ব্বত্র আছেন বলে সমগ্র বিশ্বই তাঁর অনন্তশয্যা। তিনি 'অনীয়সামনীয়াংসং স্থবিষ্টঞ্চ স্থবীয়সাম্' (গরুড়পুরাণ, পূর্ব্বখণ্ড)— তিনি ক্ষুদ্র হতেও ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ হতেও বৃহৎ।

আকাশে যে বিরাট বিস্তৃত ছায়াপথ ও তৎসহ অগণিত গ্রহনক্ষত্রের ছড়াছড়ি দেখা যায়, তা' দেখে কেউ হয়তো ভাবতে পারেন 'ইহাই নারায়ণের মহিমা'। হ্যাঁ, মহিমা তো বটেই, তবে সেটা এই ব্রহ্মাণ্ডের। আর, তার সৃষ্টিকর্ত্তা একজন ব্রহ্মা।

এইরকম অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড আছে। সেগুলির সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন অনন্তকোটি ব্রহ্মা, যাঁরা প্রত্যেকেই জাত হয়েছেন নারায়ণের নাভিপদ্ম থেকে। পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকগণ এরকম অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের কল্পনা করেছেন মাত্র। কিন্তু তার অতি সামান্য অংশই আছে তাঁদের অবগতিতে। আমরা এই একটি ব্রহ্মাণ্ডের বিস্তৃতি দেখেই হতচকিত হয়ে যাই। পৃথিবী কত বড়। এর থেকে কয়েক লক্ষ গুণ বড় সূর্য্য। আবার, কয়েক লক্ষ সূর্য্য স্থান পেতে পারে এমন বৃহৎ তারকাও নাকি আছে। এরকম সংখ্যাতীত তারকা-গ্রহ-নীহারিকা নিয়ে আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ড। এই বিপুল ব্যাপারের কতটুকু হদিশ আমরা রাখি!

তাইতো গল্প আছে, চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার একবার অহঙ্কার হয়েছিল 'আমার চাইতে বড় আর কে আছে! আমি হলাম ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা।' বিষ্ণুর দরবারে তিনি জাঁকিয়ে বসেছিলেন। তরপর একে একে সেই দরবারে প্রবেশ করতে আরম্ভ করলেন দশমুখ ব্রহ্মা, শতমুখ ব্রহ্মা, সহস্রমুখ, লক্ষমুখ, কোটিমুখ সব ব্রহ্মার দল। দেখে তো চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার চোখ ছানাবড়া। তাঁর বড়ত্বের অহঙ্কার চূর্ণ হ'য়ে গেল।

তিনি বুঝতে পারলেন, 'আমিই একমাত্র ব্রহ্মা নই, আরো ব্রহ্মা আছে এবং তারা আমার থেকে ঢের বেশী শক্তির অধিকারী।' তাইতো বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতি ভাবাবেগে রচনা করলেন—

'কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোঁহে জনমি পুন তোঁহে সমাওত
সাগর লহরি সমানা॥'

—কত কত ব্রহ্মা তোমার মধ্যে লীন হ'য়ে যায়। তোমার আদিও নেই, অন্তও নেই। সমগ্র জীবকুল সাগর-তরঙ্গের মত তোমাতেই জন্ম নেয় আবার তোমাতেই লয়প্রাপ্ত হয়।

উপরি-উক্ত কাহিনী থেকে প্রমাণিত হয়—ব্রহ্মা বহু, কিন্তু বিষ্ণু বা নারায়ণ একজন। এক বিষ্ণু থেকে জাত কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড। এক ব্রহ্মা এক ছায়াপথ (Milky way) সহ একটি ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা। এইরকম কোটি কোটি ছায়াপথ সহ অনন্ত-কোটি ব্রহ্মাণ্ডও যেখানে লীন হ'য়ে যায়, তাই নারায়ণের অনন্তশয্যা। সেই বিশাল ব্যাপ্তি, যা' মানুষের কোনরকম কল্পনাতেই আসে না, সেই

ব্যক্ত-অব্যক্ত সব কিছু ব্যাপ্ত ক'রে নারায়ণ বা বিষ্ণুর অবস্থিতি। সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হ'য়ে আছেন বলে তাঁর আর এক নাম 'বিষ্ণু' (বিষ্-ধাতু = ব্যাপ্তি)। "সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ"—সমগ্র জগৎ বিষ্ণুময়।

আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডের ছায়াপথ-সহ দৃশ্যমান এই গ্রহনক্ষত্র-পরিপূর্ণ জগৎ সেই পরম ঐশী সত্তারই ক্ষুদ্র একটি অংশ মাত্র। তাই, নারায়ণের ব্যক্ত মানুষী তনু পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ বললেন—

"বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।" (গীতা, ১০/৪২)

—এই সমস্ত জগৎ আমি আমার একটি অংশমাত্র দ্বারা ধারণ করে আছি।

নারায়ণের বিভূতি বর্ণনা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র প্রায়ই এইসব উক্তির উল্লেখ করতেন। মহাভাববাণীতে তাঁর শ্রীমুখ থেকে উচ্চারিত হয়েছে— "আমি পরমকারণ। অনন্তকোটি দেবতা, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, ব্রহ্মজ্যোতিঃ, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গজ্যোতিঃ সেই পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণের সত্তা, সত্ত্ব, আমিই সব। আমি সেই দয়ালদেশ, ব্রহ্মদেশ, পিণ্ডদেশ। আমি সেই বৃন্দাবন, আমি কৃষ্ণ, রাধা, গোপ, গোপী ;

আমার আরতি করে চন্দ্র, সূর্য্য, তারকা, কোটি কোটি গগন সব আমারই লীলা, আমারই প্রকট, আমারই জন্য আমারই ফাঁদ আর কিছু নয়।" (ষট্‌পঞ্চাশ-ত্তম দিবস) ভাবসমাধি অবস্থায় শ্রীশ্রীঠাকুরের এই বাণী কি গীতার বিভূতিযোগকেই স্মরণ করিয়ে দেয় না?

এই হ'ল নারায়ণের স্বরূপ—যার আদি নেই, অন্ত নেই, কোন পরিমাপে যাকে পরিমাপিত করা যায় না। যা' ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তার মধ্যে তিনি আছেন, আবার এর পারেও আছেন। "স ভূমিং সর্ব্বতো বৃত্বাহত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম্"—সমস্ত ভূত পদার্থের মধ্যে অনুস্যূত থেকেও তাকেও অতিক্রম ক'রে তিনি আছেন। সেইজন্য ব্রহ্ম বা ব্রহ্মাণ্ডের বিনাশ আছে, পরিবর্ত্তন আছে। কিন্তু নারায়ণ অবিনাশী, অপরি-বর্ত্তনীয়। শ্রীশ্রীঠাকুর এই সত্তাকে তাই বলেছেন 'পরাবর্ত্তনী সৎ' অর্থাৎ যা' ঠিক তেমনি থেকে চলেছে, যা' প্রতিটি পদার্থ ও বিষয়ের মধ্যে জীবনসম্বেগরূপে অন্তঃস্যূত। আর যা' পরিবর্ত্তনশীল, অর্থাৎ যার উৎপত্তি আছে, তার নাম তিনি দিয়েছেন 'অপরা-বর্ত্তনী সৎ'।

নারায়ণের নাভিপদ্ম থেকে ব্রহ্মার উৎপত্তি। এই নাভি কী? শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের কাছে এসব নিয়ে বিভিন্ন সময়ে প্রচুর আলোচনা হয়েছে। ব্যাখ্যা ক'রে তিনি বলেছেন, নাভি যেমন শরীরের মধ্যভাগ, তেমনি নারায়ণের নাভিদেশ বলতে বুঝতে হবে সেই বিশাল বিস্তৃতির মধ্যবিন্দু বা কেন্দ্রবিন্দু—বিজ্ঞানের ভাষায় 'নিউট্রাল জোন,' যাকে কেন্দ্র ক'রে 'পজিটিভ্' ও 'নেগেটিভ্' পরস্পর মিলিত হবার আবেগে বার বার আবর্ত্তিত হয়ে চলেছে। আর, দুই সমবিপরীত সত্তার মিলন-আবেগ যেখানে ঘনীভূত হ'য়ে ওঠে, সৃষ্টির সূচনা তো সেখান থেকেই হয়।

তা ছাড়া, মনুষ্যদেহের নাভিকুণ্ডলী খুব কঠিন। শবদাহের সময় দেহের সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হ'য়ে গেলেও নাভিকুণ্ডলী সহজে পুড়তে চায় না। সেইজন্যই বোধহয়, ঘনীভূত পদার্থনিচয়ের সৃষ্টি বিরাট পুরুষের নাভিদেশ থেকেই কল্পনা করা হয়েছে।

লৌকিক জগতেও আমরা দেখি, পুরুষ ও নারী দুইটি সমবিপরীত সত্তা। এরা 'পজিটিভ্' ও 'নেগেটিভ্'-শক্তি—শ্রীশ্রীঠাকুর নাম দিলেন স্বাস্ ও

চরিষ্ণু। এদের মিলন-সম্ভোগের ভিতর দিয়েই নব প্রজন্মের উদ্ভব হয়ে ওঠে, সৃষ্টিধারা অব্যাহত থাকে। গাছ, লতা, পাহাড়, মাটি, পশু, পাখী, প্রভৃতি যেখানেই সৃষ্টির প্রসার হয়েছে, সেখানেই এই সম-বিপরীত সত্তা বা শক্তিদ্বয়ের পরস্পর মিলন-আকৃতি আছেই। সৃষ্টির এই রহস্যটি এই জাগতিক বিষয়ে যেমন, মহাব্রহ্মাণ্ডের বুকেও ঠিক একই রকম। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরমাণুর মধ্যেও এই একই ক্রিয়া বিবর্ত্তিত হয়ে চলেছে। পার্শী ভাষায় ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডকে বলা হয়, 'আলমসগীর,' ইংরাজীতে 'মাইক্রোকজ্‌ম্' এবং বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডকে বলা হয় 'আলমকবীর,' ইংরাজীতে 'ম্যাক্রোকজ্‌ম্'। মাইক্রোকজ্‌ম্-এই হোক আর ম্যাক্রোকজ্‌ম্-এই হোক্ সৃষ্টির ক্রিয়া যেখানেই আছে, সেখানেই পজিটিভ্ ও নেগেটিভের আবর্ত্তন-ক্রিয়া সতত সঞ্চরমাণ। সর্ব্বত্রই 'এক তরী করে পারাপার'।

কিন্তু নাভিদেশ থেকে পদ্ম জেগে উঠল কেন? ছবিতে দেখা যায়, সেই পদ্মের উপরে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা উপবিষ্ট। এই পদ্ম কী? পদ্ম শব্দের মধ্যে আছে পদ্-ধাতু, অর্থ গতি ও স্থিতি। স্থিতি মানে

অস্তিত্ব। এর আর এক নাম সত্য। এই সত্য বা স্থিতিকে আশ্রয় ক'রেই গতি এগিয়ে চলে। এক পায়ে ভর দিয়ে তবেই আর এক পা বাড়ানো যায়। তাই, গতিসম্বেগ যেখানে আছে, সেখানে অবশ্যই আছে স্থিতিসম্বেগ। বর্দ্ধন-আকৃতি যেখানে আছে, তার পশ্চাতে আছে থাকার আকৃতি। যা' থাকে তাই তো বাড়তে পারে। যার অস্তিত্ব নেই, তার বর্দ্ধনারও প্রশ্ন আসে না। স্থিতি ও গতির উপর দাঁড়িয়ে সৃষ্টিধারার এই যে প্রথম বিকাশের সূচনা, তারই প্রতীক হল পদ্ম।

নারায়ণ যিনি, বিশ্বাত্মা যিনি, তিনি একক ছিলেন। যখন তাঁর বহুতে বিস্তৃত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হ'ল, তখন তাঁকে সেই বিশেষ ইচ্ছার মধ্যে আবদ্ধ হ'তে হল। এ ইচ্ছা কিন্তু একজাতীয় বন্ধন। কারণ, নিরাকার ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট রূপের মধ্যে সীমায়িত হ'য়ে বাঁধা পড়তে চাইলেন। অসীমের ইচ্ছা জাগল সসীম হ'তে। এরকম ইচ্ছা কিন্তু এক বিশেষ গণ্ডী বা বৃত্ত, যার মধ্যে ধরা পড়তে চাইলেন স্বয়ং বিশ্বেশ্বর। গণ্ডীবদ্ধ হওয়ার এই ইচ্ছার নাম শ্রীশ্রী-ঠাকুরের ভাষায় 'বৃত্তি-অভিধ্যান'। পরমপুরুষের যদি

বৃত্তির উপর অভিধ্যান না হ'ত, অথবা অন্য কথায় বৃত্তের মধ্যে ধরা পড়ার ইচ্ছা না হ'ত, তাহলে বাক্য ও মনের অগোচর ঈশ্বর কখনই বিভিন্ন রূপে রূপায়িত হ'য়ে সারা বিশ্বে প্রকটিত হ'য়ে উঠতেন না। তিনি যেই বৃত্তি-অভিধ্যানে রত হলেন, অমনিই সৃষ্টির সুরু হল, রূপ নিল স্থিতি ও গতি। ভাবগম্ভীর মন্ত্রধ্বনিতে উচ্চারণ করলেন শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র—

"স্ব-অয়নস্যূত
গতি ও অস্তি
বৃত্ত্যভিধ্যান-তপস্যায়
অধিজাত হইল।" (প্রার্থনা)

নাভিপদ্মের উপরে জন্মগ্রহণ করলেন ব্রহ্মা। তিনি কে? ব্রহ্মা-শব্দটি এসেছে সংস্কৃত বৃংহ্-ধাতু থেকে, অর্থ বৃদ্ধি, দীপ্তি। তাহলে যেখানে প্রকাশ আছে এবং বর্দ্ধনার আকৃতি আছে, তাই ব্রহ্ম বা ব্রহ্মা। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—

"যিনি
সব যাহা কিছুতে
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া দেদীপ্যমান,—
সেই ব্রহ্মকে নমস্কার করি।" (প্রার্থনা)

দ্বিজগণ সন্ধ্যা-আহ্নিকের সময় "নমো ব্রহ্মণে" বলে ব্রহ্মকে প্রণাম করেন। কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। সেই ব্রহ্ম কে? কেন তাঁর অমনতর নাম, তাঁকে নতিই বা জানাতে হবে কেন, এসব কথা জানা ও বোঝা হয় না। জানাতে ও বোঝাতে পারেন একমাত্র সদ্‌গুরু। তাই সদ্‌গুরু লাভ না হ'লে মানুষের বোধের দ্বারই উন্মুক্ত হয় না।

ব্রহ্মা থেকে ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব। তাই, নারায়ণ সৃষ্টিকর্ত্তারও উৎস। নারায়ণপূজা মানে সমগ্র সৃষ্টির উৎসের উৎসকে ধ্যান করা ও সংবর্দ্ধিত করে তোলা।

মূর্ত্তি ছাড়া শালগ্রামশিলাতেও নারায়ণপূজা করা হয়। শালগ্রাম শিলার মধ্যে নারায়ণের কল্পনা কিভাবে হ'তে পারে? শোনা যায়, ঐ আকারের পাথর নাকি দক্ষিণ ভারতে নর্ম্মদা নদীর তীরে অনেক পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ শিলার আকারটি ডিম্বাকৃতিই বা হ'তে হবে কেন? এসব নিয়েও প্রশ্ন করা হয়েছিল দয়াল ঠাকুর শ্রীঅনুকূলচন্দ্রকে। যে ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন তা নিম্নোক্ত রূপ :—

শালগ্রামশিলা হল ব্রহ্মাণ্ডের প্রতীক। ব্রহ্মাণ্ডের আকৃতিটা ডিম্ব সদৃশ (ডিমের মত আকার),—

মানে, ঠিক নিখুঁত জ্যামিতিক বৃত্ত নয়, বরং বলা যায় খানিকটা বৃত্তের মত। শ্রীশ্রীঠাকুর এর নাম দিলেন 'বৃত্তাভাস'। এই বৃত্তাভাস-গতি সৃষ্টির প্রতিটি ধাপে বর্ত্তমান। নীহারিকামণ্ডলকে কেন্দ্র ক'রে যে অসংখ্য সৌরজগৎ আবর্ত্তিত হ'য়ে চলেছে তারা এই গতিতে পরিক্রমা করছে। আবার, সূর্য্যকে কেন্দ্র করে গ্রহগণ যে কক্ষপথে আবর্ত্তিত হয়ে চলেছে, সেই কক্ষের গতিও ডিম্বাকৃতি। এমন কি, একটি ক্ষুদ্র কণার মধ্যেও প্রোটনকে কেন্দ্র করে ইলেক-ট্রনের যে আবর্ত্তন তাও তদ্রূপই। ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্ব-স্তরে এই যে ডিম্বাকৃতি গতি বিদ্যমান, সেই গতিরই প্রতীক ঐ শালগ্রামশিলা। সেইজন্য শালগ্রামশিলা ডিম্বাকৃতি হওয়াই বিধেয়।

নারায়ণপূজা মানে নারায়ণের প্রীতিকর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা এবং তাঁর অনভিপ্রেত কিছু না-করা। অন্য কথায় বলতে গেলে, মানুষের জীবনবৃদ্ধি যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে তাই ক'রে চলা এবং যে চিন্তা বা কর্ম্ম সুস্থ দেহ-মন নিয়ে বেঁচে থাকার ব্যাঘাত ঘটায় তা' বর্জ্জন করা। ক্রিয়াযোগসারে (১৮শ অধ্যায়) নারায়ণের প্রীতিকর কর্ম্ম বলা আছে—সর্ব্বভূতে দয়া,

নিরহঙ্কার, তাঁর উদ্দেশ্যে ভক্তিপূর্ব্বক ধর্ম্মকার্য্যানুষ্ঠান, যথার্থ বাক্য-কথন, মিষ্ট বস্তু তাঁর উদ্দেশ্যে নিবেদন, পরহিংসাবিহীনতা, মান-অপমান তুল্যজ্ঞান, গো ও ব্রাহ্মণ-হিতৈষিতা, শাস্ত্রনিয়ম-পরিপালন, উপকার প্রত্যাশা না ক'রে দান, ইত্যাদি। আর, নারায়ণের অপ্রীতিকর কর্ম্ম—হিংসা, ক্রোধ, অসত্য, অহঙ্কার, ক্রূরতা, পরনিন্দা, পিতা-মাতা-ভ্রাতা-পত্নী-ভগিনী ত্যাগ, গুরুজনের প্রতি কটুবাক্যপ্রয়োগ, শ্রেয়জনকে অবজ্ঞা, পরদ্রব্যহরণ, জলাশয় নষ্টকরণ, পরস্ত্রীদর্শনে আকুলতা, পাপচর্য্যাশ্রবণ, অনাথ ব্যক্তিকে দ্বেষকরণ, বিশ্বাসঘাতকতা, বেদনিন্দা, পরদারাসক্তি, মিত্রদ্রোহ, বৈষ্ণবনিন্দা, ইত্যাদি। দেখা যাচ্ছে, এই অপ্রীতিকর কর্ম্মগুলি অপরের ক্ষতি করে, সমাজের অমঙ্গল করে, নিজের মনকে সঙ্কুচিত করে, শরীরে অবসাদ আনে, মনে সবসময় একটা ভয় ভয় ভাব থাকাতে মনের প্রসারতা নষ্ট ক'রে দেয়। ফলে, বিস্তারের পথও বন্ধ হয়। আর, বিস্তার বা বৃদ্ধির পথ যেখানে নেই, সেখানে নারায়ণও নেই।

নারায়ণ জীবনের পথ ও বৃদ্ধি পাওয়ার পথ। এ পথের পরিপোষণ যাতে হয় তাই প্রকৃত নারায়ণ-

পূজা। আর, ঐ পথ বাদ দিয়ে হাজার 'নারায়ণায় নমঃ' বলে ফুল দিলে বা 'নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়' বলে আভূমি প্রণাম করলে কোন লাভ হয় না। নারায়ণ-সেবা শুধু বিশেষ সময়ে বিশেষ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই সংঘটিত হ'য়ে থাকে তাই নয়। জীবনের প্রতিপদক্ষেপেই আছে নারায়ণের সেবা। এ ব্যাপারে দয়াল ঠাকুর শ্রীঅনুকূলচন্দ্র আমাদের বিশেষভাবে সজাগ ক'রে দিয়েছেন তাঁর অজস্র বাণীর মধ্য দিয়ে। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক।

সৎসঙ্গিগণ নিয়মিত আহার্য্যগ্রহণের পূর্ব্বেই ইষ্টার্থে ইষ্টভৃতি নিবেদন করেন। ইষ্টভৃতি প্রতি ত্রিশ দিনে ইষ্টসন্নিধানে পাঠিয়ে দিতে হয়। ইষ্ট-ভৃতি যেদিন পাঠানো হয়, সেদিন দুজন গুরুভ্রাতাকে দুটি ভ্রাতৃভোজ্য দেবার নিয়ম আছে। কেউ যদি কোন কারণে অবজ্ঞা ক'রে ঐ ভ্রাতৃভোজ্য গ্রহণ না করে, তাহলে সে নারায়ণকেই অস্বীকার করে। সে যতই চোখ বুঁজে 'ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডল-মধ্য-বর্ত্তী...' বলুক অথবা মুখে ঠাকুর-ঠাকুর করুক, নারায়ণ তাতে প্রীত হন না। এবিষয়ে একটি ছড়া দিয়েছেন যুগপুরুষোত্তম শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র—

"ইষ্টভৃতির ভ্রাতৃভোজ্য
অবজ্ঞা ক'রে নেয় না,
পায়ে লক্ষ্মী সেই তো ঠেলে
নারায়ণে চায় না।" (অনুশ্রুতি ১ম)

এরকম আরো বহু বাণী ও ছড়ার মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুর দেখিয়ে দিয়েছেন দৈনন্দিন প্রতিটি ব্যাপার ও বিষয়ের মধ্যে কিভাবে নারায়ণসেবা ওতপ্রোত হয়ে আছে।

কথিত আছে, নারায়ণের স্ত্রী লক্ষ্মীদেবী। লক্ষ্মী হচ্ছেন ধনসম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা! তাঁর কৃপা হ'লে অর্থসম্পদ লাভ হয়। এই উদ্দেশ্যে গৃহস্থের বাড়ীতে কত ঘটা করে লক্ষ্মীপূজা হয়, লক্ষ্মীর আড়ি পাতা হয়, আলপনা দেওয়া হয়, ইত্যাদি। কিন্তু বহু আড়ম্বরে লক্ষ্মীপূজা করার পরেও হয়তো দেখা যায়, গৃহস্থের দারিদ্র্যদশা ঘুচছে না, ঘরে তার লক্ষ্মীশ্রী কিছুতেই থাকছে না। কিন্তু তা' তো হওয়া উচিত নয়। যে-কাজের যে-ফল তাই-ই হওয়া উচিত। লক্ষ্মীপূজায় লক্ষ্মীলাভ হওয়াই উচিত। তা' যখন হচ্ছে না, তখন বুঝতে হবে সেই ক্রিয়ায় কোন গোলমাল আছে। আরো পরিষ্কার ক'রে বলা যায়,

লক্ষ্মীপূজাই বিধিমত হচ্ছে না।

তাহলে কেমন প্রক্রিয়ায় লক্ষ্মীর আরাধনা ঠিকমত করা হয়? এ সম্বন্ধে অপূর্ব্ব সমাধানবাণী এনে দিয়েছেন যুগত্রাতা পুরুষোত্তম শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র। আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন একদিন—

"নারায়ণকে খুশি করতে পারলে লক্ষ্মী আপনি এসে ধরা দেন, আর নারায়ণকে তোয়াক্কা করে না, সতী-স্ত্রী লক্ষ্মী কি তার কাছে এগোন? তিনি তাকে এড়িয়েই চলেন, সে তাঁকে যতই তোয়াজ করুক না কেন। নারায়ণ মানে বৃদ্ধির পথ, মূর্ত্ত নারায়ণে যুক্ত হ'য়ে তাঁকেই মুখ্য ক'রে বাস্তবভাবে বৃদ্ধির পথে বিস্তারের পথে চলতে হবে। তবেই নারায়ণ-পূজা সার্থক হবে, লক্ষ্মীও বরণডালা সাজিয়ে নিয়ে এসে ধরা দেবেন। এ বাদ দিয়ে উন্নতি যে হয় না, তার কারণ, মানুষ প্রবৃত্তিপন্থী হ'য়ে পড়লে তার কাছে টাকা বড় হয়, মানুষ হ'য়ে যায় ছোট, সে মানুষের সংস্রব হারায়।"

আবার ছোট্ট ছড়াতেও বললেন—

"মানুষ আপন টাকা পর
যত পারিস্ মানুষ ধর।"

অন্যত্রও বলেছেন,"মানুষ হ'ল লক্ষ্মীর বরযাত্রী।"

এ থেকে আমরা বুঝতে পারি, নারায়ণকে প্রীত করতে না পারলে লক্ষ্মীর অনুগ্রহ লাভ করা যায় না। আর নারায়ণের সেবা মানে মানুষের সেবা—মানুষ যাতে সুস্থ নীরোগ সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে থাকে তাই ক'রে চলা। কিন্তু আমরা প্রত্যেকেই কমবেশী প্রবৃত্তির অধীন।

প্রবৃত্তিপথ হ'ল ঈশ্বরের বিপরীত পথ বা শয়তানের পথ। প্রবৃত্তির অধীন থেকে যদি আমরা লোকসেবা করতে যাই, তাহলে মানুষের সর্ব্বাঙ্গীণ সাত্বত কল্যাণ করা কিছুতেই সম্ভব নয়। কারণ, প্রবৃত্তিপাশের মধ্যে আছে দম্ভ, অভিমান, লোভ, স্বার্থপরতা, ঈর্ষ্যা, আত্মম্ভরিতা, প্রভৃতি। যে-মানুষের মধ্যে এসব বর্ত্তমান, সে তার কথা ও কাজের মধ্যে দিয়ে তারই অভিব্যক্তি দিতে পারে মাত্র। সে মানুষের জন্য কিছু করতে গেলেই তার মধ্যে প্রাধান্য পাবে ঐ অবগুণগুলি। ঈশ্বর চান মিলন, আনন্দ, স্বস্তি, মনের প্রসারতা, সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়। প্রবৃত্তি-অধীন মানুষের এসব গুণ থাকে না। তার নিজের ব্যাপারটাই তার কাছে সব চাইতে বড়

হ'য়ে দাঁড়ায়। প্রবৃত্তির বৃত্তেই সে ঘুরপাক খেতে থাকে। তার বাইরে কিছু দেখার শক্তি তার থাকে না। সে হয় আত্মকেন্দ্রিক। তাই, অপরকে সে বুঝতে পারে না, বুঝতে চায়ও না। মানুষের সত্তা-গত স্থায়ী কল্যাণসাধন করা তার পক্ষে অসম্ভবই হ'য়ে থাকে। কেউ যদি হয় স্বার্থপর-মনোবৃত্তিসম্পন্ন, সে সব কাজের মধ্যেই কিভাবে নিজের দু'পয়সা হবে, কতটুকু লাভ হবে, সেই ধান্ধা নিয়ে চলবে। কেউ যদি অহঙ্কারে মদমত্ত বা আত্মপ্রতিষ্ঠা-পরায়ণ হয়, সে সব ব্যাপারের মধ্যেই তার প্রধানত্ব যাতে অটুট থাকে তাই ক'রে চলবে। তার সমকক্ষ বা তার চাইতে বড় এমন কাউকে সে সহ্য করতে পারবে না। তার নিজের নাম-যশ ও প্রতিষ্ঠা নিয়ে যেখানে মাতামাতি হয় না, তা' যত মঙ্গলকর বিষয়ই হোক, সে বিষয়ে তার কোন আগ্রহ থাকে না। মানুষকে বড় করে তোলা বা অপরের ন্যায্য প্রশংসা করা তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। তার ঠুনকো মানের বড়াইয়ে সে উচ্চকেও শ্রদ্ধা করতে পারে না। এইভাবে প্রতিপদে তার মানুষের সাথে অসহ-যোগ হ'তে থাকবে; মানুষের সত্তাগত প্রয়োজন

বুঝে চলা তার পক্ষে অসম্ভব হবে। সেইজন্য, প্রবৃত্তির আকর্ষণের উপরে উঠতে না পারলে মানুষের প্রকৃত সেবা করা সম্ভব নয়।

কিন্তু নিজ চেষ্টায় প্রবৃত্তির উপরে ওঠা যায়ও না। এজন্য চাই একটা অবলম্বন, যাকে ধ'রে উঠতে হবে। সেই অবলম্বন-দণ্ডই হচ্ছেন মানুষের ইষ্ট, সদ্‌গুরু—মূর্ত্ত নারায়ণ। তাঁর উপরে টান হ'লেই অন্য সব টানের শক্তি কমে যায়। এইভাবে কাটানো যায় প্রবৃত্তির বাঁধন। তাই তিনিই একমাত্র উপাস্য, আরাধ্য, শরণীয়।

ঈশ্বর অব্যক্ত, অচিন্তনীয়। তাঁকে চিনিয়ে দেন, জানিয়ে দেন ঐ ইষ্টগুরু। তাই, 'তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ'। সেই পরব্রহ্ম নারায়ণের পরম পদ ('তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদম্‌') যিনি দেখিয়ে দেন তিনিই মানুষের ইষ্ট, আচার্য্য। তিনি স্বয়ং ঘোষণা করেন, 'আমাকে আচার্য্য ব'লে জানবে' (শ্রীমদ্‌ভাগবত)। আর, সেই পরম পদ কী? পরম মানে শ্রেষ্ঠ, আর পদ্‌-ধাতুর অর্থ গতি, চলা। তাই, পরম পদ মানে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চলার রীতি। সে রীতি হল বাঁচাবাড়ার পথ, স্বস্তির পথ, শান্তির

পথ—যা' মানুষের পরম কাম্য।

বিষ্ণু সেই পরম পদে নিত্য অবস্থান করেন, মানে বিশ্বজগতে সাত্বত বিধি হিসাবে তিনি নিত্য বর্ত্তমান। জীবন ও বর্দ্ধনকে কেন্দ্র ক'রেই আবর্ত্তিত বৈষ্ণবী নীতি। বিষ্ণু কখনও তাঁর এই পথ থেকে চ্যুত হন না। তাই, তাঁর আর এক নাম 'অচ্যুত'। আর, মর্ত্ত্যধামে তাঁরই জীয়ন্ত সচল রূপ হলেন গুরু-পুরুষোত্তম।

বিশ্বেশ্বর নারায়ণ যখনই গুরুরূপে মানুষী তনু আশ্রয় ক'রে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন, তিনি শিখিয়েছেন নারায়ণ-উপাসনা। নানা ইঙ্গিতে, কখনও স্পষ্ট ভাষায় তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে তিনিই সেই। তাঁর আদেশ পালন ক'রে চললে, তাঁকে তৃপ্ত ও প্রীত করতে পারলেই প্রকৃত নারায়ণ-পূজা করা হয়।

যুগে যুগে এই বার্ত্তা নিয়ে এসেছেন প্রেরিত-পুরুষগণ। কলির এই শেষ যামে জগতের জন্য সেই শিক্ষা নিয়ে আবার আবির্ভূত হলেন পরম দয়াল শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র। মানুষকে তিনি নারায়ণমুখী ক'রে তুললেন। দৈনন্দিন জীবনের

আচরণের ভিতর দিয়ে তিনি দেখালেন নারায়ণপূজা কী! আবার, কথাপ্রসঙ্গে মাঝে মাঝে প্রাণদোলনী সুরে ও ছন্দে তিনি গেয়ে উঠেছেন—

"নারায়ণঃ পরা বেদাঃ নারায়ণঃ পরাক্ষরাঃ।
নারায়ণঃ পরা মুক্তির্নারায়ণঃ পরা গতিঃ॥"

মহাদেব

মহাদেব বা শিব বলতেই আমাদের চিত্তজগতে একটি মূর্ত্তির উদয় হয় যিনি যোগাসনে উপবিষ্ট, বাঘের ছাল পরিহিত, ত্রিশূল ও ডমরুধারী, গলায় তাঁর সাপ ইত্যাদি। কিন্তু এমন একটি মানুষ আমরা ছবির পাতায় এবং পাথর বা মাটির প্রতিমার মধ্যে ছাড়া তো বাস্তবে দেখতে পাই না। অথচ বহুকাল থেকেই দেশে সাড়ম্বরে শিবপূজা চ'লে আসছে। শিব-উপাখ্যান নানাভাবে ছড়িয়ে আছে পুরাণে, গাথায়, কাব্যে, শিল্পকলায়। ভারতের এক সুবিপুল জনসমাজ শৈবকৃষ্টির অনুশীলন নিয়ে চলেছে।

পৌরাণিক সকল ব্যক্তিত্বেরই বাস্তব অস্তিত্ব ছিল। তাঁরা বা তাঁদের মত লোক এই দুনিয়ায় বসবাস করতেন। পরবর্ত্তীকালে তাঁরা দেবতায় রূপান্তরিত হয়েছেন। পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রও তাই বলেন। তিনি আরো বলেছেন, দিব্‌ধাতু (দীপ্তি) থেকে দেবতা-শব্দের উদ্ভব। ইষ্টা-

সুগ সাধনা, কর্ম্ম ও লোকসেবার ভিতর দিয়ে যাঁরা দীপ্তিমান চরিত্রের অধিকারী হ'য়ে উঠেছেন তাঁরাই দেবতা ব'লে পরিগণিত হয়েছেন।

শিব নামেও পুরাকালে কেউ একজন ছিলেন। স্বীয় চরিত্র, ব্যক্তিত্ব দ্বারা তিনি তৎকালীন জন-সমাজে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তাঁর আদর্শ ও ভাবধারা দেশে সুপ্রচারিতও হয়েছিল।

কে এই শিব ? 'শিব' শব্দটির মানেই মঙ্গল। তাই, যিনি পরম মঙ্গলময়, যিনি নিখিলক্ষেমবিধাতা, তিনিই শিব। আবার, শিব-শব্দের উৎপত্তি শী-ধাতু (শয়ন) থেকে। তার মানে, সবাই এবং সব কিছু যাঁর মধ্যে শায়িত বা অধিষ্ঠিত, যিনি সবারই আশ্রয়। মঙ্গলকে আশ্রয় না ক'রে বাঁচতে পারে কে ? তাই, শিব সবারই আশ্রয়স্থল।

তাঁর আর এক নাম শম্ভু। শম্ মানে কল্যাণ এবং ভূ-ধাতু মানে হওয়া। যিনি কল্যাণরূপী হ'য়ে আছেন বা মূর্ত্ত কল্যাণ, তিনিই শম্ভু। কিভাবে প্রাণিগণের কল্যাণ করতে হয় তা' তাঁর আচরণে নিয়ত প্রকাশিত। আবার, এই কল্যাণ করার পথে অনেক রকম বাধাবিঘ্ন এসে হাজির হয়। বহু

ঘাত-প্রতিঘাত আসে। কারণ, 'শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি' —শুভ কাজে শতেক বাধা। সেই সব বিরুদ্ধশক্তি জয় ক'রে শিব-ব্যক্তিত্ব যিনি, তিনি তাঁর উদ্দেশ্য সাধন করেন। সংসারের বিভিন্ন টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে যে হলাহল ওঠে তা' তিনি নিজে গ্রহণ করেন। ক'রে জগৎকে রাখেন বিষমুক্ত। তাই তিনি 'নীলকণ্ঠ'। তিনি চান জীবের কল্যাণ। অমঙ্গলের বিষে যেন কেউ জর্জ্জরিত না হয়, এই তাঁর লক্ষ্য। এই পৃথিবীতে শিবময় ব্যক্তিত্ব নিয়ে যে-পুরুষ যখনই আবির্ভূত হন, তাঁর চরিত্র এমনতরই হয়।

তাইতো তিনি ভূতনাথ, ভূতেশ, ভূতভাবন। ভূত বলতে আমরা কতকগুলি উদ্ভট চেহারার মনুষ্য-তুল্য প্রাণীর কথা বুঝি। তা' নয়। ভূত মানে 'যাহা কিছু হইয়াছে' অর্থাৎ স্থাবর-জঙ্গম যা'-কিছু। প্রাণিকুল কিভাবে সুস্থ থাকে, ভাল থাকে তাইই ক'রে চলেন মহাদেব। তাই তিনি ভূতনাথ—সবারই প্রাণের দেবতা। ভূত নিয়েই তাঁর চলাফেরা।

সর্ব্বক্ষণের জন্য মহাদেবের কাছে আছে দুটি অনুচর—নন্দী এবং ভৃঙ্গী। তা'রা কা'রা? তা'রা

দু'টি শক্তি। নন্দীশব্দের উৎপত্তি নন্দ্-ধাতু থেকে, মানে আনন্দ, আর ভৃঙ্গী এসেছে ভৃ-ধাতু থেকে মানে ভরণ, পোষণ ও ধারণ করা। মহাশক্তিশালী মহাদেব যিনি তাঁর মধ্যে এই দু'টি শক্তি স্বতঃস্ফূর্ত্ত। তাঁর সান্নিধ্যে যেয়ে মানুষ নিরাবিল আনন্দ লাভ করে, দুঃখকষ্ট জয় করার শক্তি লাভ করে। এই হ'ল নন্দী-শক্তি। সাথে-সাথে পায় প্রেরণা, তার বৈশিষ্ট্যানুপাতিক পরিপোষণ, বিচ্ছিন্নতাবাদ ও তমোভাবকে জয় করার শক্তি লাভ করে। অপর কথায় বলা যায়, মানুষের মধ্যে বেড়ে ওঠে সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের গুণরাজি। এই হ'ল ভৃঙ্গী-শক্তির ক্রিয়া। সংসারে-সমাজে চলতে হ'লেই মানুষের এই সব গুণ থাকা একান্ত প্রয়োজন। নতুবা সাফল্যের সঙ্গে চলা যায় না। আর, ইষ্টানুগ কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির অনুশীলনের ভিতর দিয়ে যিনি যত বড় দ্যুতিমান চরিত্রের অধিকারী হ'য়ে উঠেছেন, তিনি ততখানি এইসব বিশেষ গুণে সহজভাবে অভিষিক্ত।

আমরা বইতে পড়ি বা নাটকাদিতে দেখি যে নন্দী-ভৃঙ্গীর কাজ হ'ল শিবের কাছে ব'সে সিদ্ধি

ঘোঁটা। সিদ্ধি ঘুঁটে ভালমত মিশিয়ে নিয়ে তারা পরমানন্দে তা' পান করছে, আবার শিবের জন্য তৈরী ক'রেও দিচ্ছে। ব্যাপারটা যেন কোন মাদক-দ্রব্য খাওয়ার মতন। ভাঙ্গকেও সিদ্ধি বলা হয়। নন্দী-ভৃঙ্গী দুই অনুচর মিলে যা' ঘাঁটছে তা' যেন ঐ গাঁজা-ভাঙ্গের মতই কিছু নেশার বস্তু। কিন্তু যে মহাদেব মহামায়া পার্ব্বতীর স্বামী, কার্ত্তিক-গণেশ যাঁর বরপুত্র, লক্ষ্মী-সরস্বতীর মত সর্ব্বসুলক্ষণা কন্যা যাঁর, তিনি কি সাধারণ নেশাখোরের মত ভাঙ্গখোর হ'য়ে দিন কাটান? বিবেচনা কী বলে?

যুগপুরুষ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র বললেন যে, এ সিদ্ধি কোন মাদকদ্রব্যের নেশা নয়। এ হ'ল কর্ম্মে কৃতার্থ হওয়ার পরমানন্দ তথা আত্মপ্রসাদ। নন্দী আনন্দদায়ী শক্তি ও ভৃঙ্গী ভরণ-পোষণকারী শক্তি, এ দু'য়ের বিহিত ব্যবহার ও অনুশীলনের ভিতর দিয়েই জেগে ওঠে সিদ্ধির সৌন্দর্য্য। আর, প্রকৃত শিব-ব্যক্তিত্বই হন সিদ্ধির উৎস। শিব-চরিত্রই সিদ্ধির আনন্দ উপভোগ করে। তাই, কবি ভারতচন্দ্র মহাদেবের গুণকীর্ত্তন প্রসঙ্গে মহামায়ার মুখ দিয়ে বলিয়েছেন, "অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ"।

সর্ব্বযোগের, সর্ব্বসিদ্ধির অধিপতি মহাদেব। তাই তাঁর আর এক নাম যোগীশ্বর বা যোগেশ্বর। সকল বোধ, দর্শন ও জ্ঞান তাঁর অধিগত। সেইজন্য তাঁর অপর নাম 'পশুপতি', অর্থাৎ জ্ঞান ও দর্শনের অধিপতি। পশু বলতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি জন্তু, ইতর প্রাণী। কিন্তু পশু-শব্দের আর একটি ব্যুৎপত্তি আছে দর্শনার্থক পশ্-ধাতু থেকে, অর্থাৎ সবিশেষ-ভাবে যিনি সব কিছু দর্শন ও বোধ করতে পারেন তিনিই পশু (দ্রষ্টব্যঃ কুলার্ণব ও মহানির্ব্বাণতন্ত্র)। সেইজন্য, শিবের পশুপতি নামের মধ্যেকার পশুশব্দটি সাধারণ চলিত অর্থে নয়, বরং প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিদের বিশিষ্ট অর্থে প্রযুক্ত।

শিবপূজায় বেলপাতা অপরিহার্য্য। বিল্বপত্র শিবের এত প্রিয় কেন? কারণ, বেল, বেলপাতা, বেলের শিকড়, ছাল, কুঁড়ি, প্রত্যেকটারই ভেষজ গুণ অসীম। বিভিন্ন অসুখে এগুলির বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় প্রয়োগ হ'য়ে থাকে। চরক, সুশ্রুত ও অন্যান্য কবিরাজী গ্রন্থে এ বিষয়ে বিশদভাবে লেখা আছে। বিহিত মাত্রায় এগুলি ব্যবহার করলে জ্বর, বাত, উদরঘটিত পীড়া প্রভৃতি বহু রোগের উপশম, হয়।

এই সব কারণে বিল্বপত্রে শিব অতি তুষ্ট।

সুস্থ দেহ ও মন নিয়ে কিভাবে সপরিবেশ বেঁচে থাকা যায়, সে-চলার কৌশল শিবের অধিগত। তাই, তাঁর অপর নাম 'বৈদ্যনাথ'। বৈদ্যনাথ-শব্দের উৎপত্তি বিদ্-ধাতু থেকে, অর্থ অস্তিত্ব, বর্ত্তমান থাকা। বৈদ্য তিনিই যিনি বিদ্যমানতার মরকোচগুলি জানেন, সত্তাঘাতী যা', যা' জীবনকে অসুস্থ ও ত্রস্ত ক'রে তোলে, তার কারণ অপসারণ ক'রে জীবনকে সুস্থ ও স্বস্থ ক'রে তোলার তুক জানেন। বৈদ্যদের প্রভু যিনি তিনিই বৈদ্যনাথ। মঙ্গলময় শিবের মধ্যে বৈদ্যনাথত্ব স্বতঃ-উৎসারিত থাকে।

মহাদেব বৃষভবাহন। বৃষ হ'ল ধর্ম্মের প্রতীক ('বৃষো হি ভগবান ধর্ম্মঃ'—আগম)। সে চতুষ্পাদ। কথিত আছে, ধর্ম্ম যখন চতুষ্পাদ তখনই সে পূর্ণ মহিমায় বিকশিত (দ্রষ্টব্যঃ মনুসংহিতা, ১।৮১)। তার মানে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তা' অভিব্যক্ত। এখানে বৃষ সেই পরিপূর্ণ ধর্ম্মের প্রতীক। আর, মূর্ত্ত মঙ্গল (শিব) যিনি তিনি সেই পরিপূর্ণ ধর্ম্মের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। তাঁর চলা-বলা-করা-ভাবা সবই ধর্ম্মাশ্রয়ী।

মহাদেবের গাত্রবর্ণ 'রজতগিরিনিভ', অর্থাৎ রূপালী পর্ব্বতের ন্যায় শুভ্রবর্ণ। সাদা কেন? সাদা হ'ল সমস্ত রঙের সমাহার। সমস্ত বর্ণ, সকল বিভিন্নতা তাঁর মধ্যে এসে সমন্বয় লাভ করেছে। সকল তত্ত্ব ও তথ্যের সার্থক সমাহার তিনি। তারই প্রতীক ঐ শ্বেতবর্ণ।

মহাদেবের কণ্ঠে সাপের মালা। তাই, তাঁর আর এক নাম 'ফণিভূষণ'। গলায় এই সাপের অস্তিত্বকে নানা জনে নানা দিক দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু পরমদয়াল শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে আমরা জেনেছি, ঐ সাপ হ'ল সাপের মত খল হিংস্র ব্যক্তির প্রতীক। সমাজে সাপের মত চরিত্র-ওয়ালা লোক ঢের আছে। মহাদেব তাদের প্রেমে বশীভূত ক'রে কাছে রেখে দেন, যা'তে তারা বাইরে যেয়ে বৃহত্তর সমাজের ক্ষতি করতে না পারে। আবার তাদের ভিতরেও যে সত্তাপ্রীতি আছে তা' উস্কে দিয়ে ঐ অমনতরদের দ্বারা লোকমঙ্গল যত-টুকু করানো সম্ভব তাও করিয়ে নেন। এই হ'ল শিবভাবের বৈশিষ্ট্য। তিনি যে ভূতপতি, ভূতেশ্বর। কাকে বাদ দেবেন তিনি? তাঁর রাজত্বের বাইরে

তো কেউ নেই, কিছু নেই। বিশ্বদুনিয়ায় যারা কপট-কুটিল, তাদেরও তিনি ফেলে দেন না। কুশল-কৌশলী সুনিয়ন্ত্রণের ভিতর দিয়ে তাদের অন্তরে নিষ্ঠা-আনুগত্য-কৃতিসম্বেগের চেতনা জাগ্রত ক'রে তাদিগকে শ্রেয়-প্রবুদ্ধ ক'রে তোলেন। সমস্ত অসৎকে তিনি সৎ-এ এবং সমস্ত অশুভকে শুভে নিয়ন্ত্রিত করেন।

মহাদেবের পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম। তার কারণ, ব্যাঘ্র হ'ল সাহসী, বীর্য্যবান অথচ কৌশলী প্রাণী। ব্যাঘ্রের চর্ম্ম ঐ গুণগুলির দ্যোতক। লোকপালন-ক্রিয়ায় সাহস, শৌর্য্য ও কুশলতার প্রয়োজন হয় প্রতিপদে। তাই, ঐ গুণগুলি শিব-চরিত্রের সহজ সম্পদ।

মহাদেবের মস্তকে চন্দ্রের একটি কলার (অংশের) অধিষ্ঠান। তাই, তাঁর অপর নাম 'চন্দ্রেশ্বর'। চন্দ্রের স্থান মহাদেবের মস্তকে, কারণ পৃথিবীতে জীবনপ্রবাহ সচল রাখতে চন্দ্রের ক্রিয়া অপরিসীম। চন্দ্রের তেজে পৃথিবীর ওষধিসমূহ পরিপুষ্ট হয়। চন্দ্রের আকর্ষণে সমুদ্রে জোয়ার-ভাটার সৃষ্টি হয়। ফলে, মাটি উর্ব্বরা থাকে, শস্যাদি উৎপন্ন হয়।

জীবনের পক্ষে এমনতর প্রয়োজনীয় যে চন্দ্র, মহাদেব তাকে শিরোভূষণ ক'রে রেখেছেন। মঙ্গল মানেই তো জীবন-বৃদ্ধি যাতে উচ্ছল হ'য়ে চলে। জীবন-বৃদ্ধির অনুপূরক বা সহায়ক যা' সব কিছুই শিবের বিভূতির অঙ্গ।

ত্রিশূল তাঁর অস্ত্র, নিয়ত শোভা পায় তাঁর শ্রীহস্তে। তাই তিনি 'শূলপাণি'। এই ত্রিশূল মহাদেব ব্যবহার করেন দুষ্ট দানব-বধে। অর্থাৎ যে-শক্তি জীবজগতের বাঁচাবাড়ার অন্তরায় তাকে তিনি ত্রিশূল দ্বারা বিনাশ করেন। ঐ অস্ত্র, পরম-মঙ্গলময় যিনি তাঁর সত্তাসংরক্ষণী অসৎ-নিরোধী মহাশক্তির প্রতীক।

ত্রিশূলের তিনটি ফলা। এই তিন ফলার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কেউ বলেন, এর দ্বারা সত্ত্ব-রজ-তম তিন গুণ-কেই বোঝাচ্ছে। তিনটি গুণই মহাদেবের করায়ত্ত। তিনি কোনটির দ্বারা অভিভূত নন। লোকপালনের জন্য যখন যে গুণটি দরকার, তিনি তার ব্যবহার ক'রে থাকেন। কারো মতে, ত্রিশূলের তিনটি ফলা সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের দ্যোতক। তাই যেমন-তিনি ভূত-ভাবন, ভূতপতি, তেমনি আবার সংহারকারী রুদ্রও

বটেন।

ত্রিশূলের সঙ্গেই থাকে শিবের নিত্যসাথী 'ডমরু'। ডমরু ধারণ করেন ব'লে তাঁর আর এক নাম 'ডমরুধর'। ডমরুর তাৎপর্য্য কী? ডমরু হ'ল শব্দের প্রতীক। ডমরু বাজালে গুরু-গুরু বা গুম-গুম ক'রে আওয়াজ হয়। সেই আওয়াজ হ'ল প্রথম স্বর। তা' থেকে বর্ণমালার উদ্ভব। কথিত আছে, সংস্কৃত ব্যাকরণ-প্রণেতা মহামুনি পাণিনি ছিলেন শিবভক্ত। এক সময় তিনি শিবের আরাধনা করছিলেন। তখন মহাদেব তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হ'য়ে 'নবপঞ্চবার' অর্থাৎ পঁয়তাল্লিশ বার ডমরু ধ্বনি করলেন। এক একবারে এক একরকম শব্দ উত্থিত হ'ল। সেই শব্দরাজিই হ'চ্ছে সমস্ত স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ। ঐগুলি আবির্ভূত হয় সূত্রাকারে। সূত্রগুলি এইরকম—'অইউণ্। ঋলৃক্। কপয়্। হল্।' ইত্যাদি। শিবকৃপায় এগুলি লাভ করলেন ব'লে পাণিনি সূত্রগুলির নাম রাখলেন 'শিবসূত্র'। প্রকৃত তথ্য মনে হয়, শিবচিন্তায় একধ্যানপরায়ণ হ'য়ে থাকা ও চলার ভিতর দিয়ে পাণিনির চিত্তে ঐ শব্দগুলি ঐ আকারে প্রতিভাত হ'ল।

(যেমন সুদীর্ঘকাল যাবৎ অচ্যুত সুকেন্দ্রিক অনুশীলন ও গবেষণার ভিতর দিয়ে কোন বৈজ্ঞানিক নতুন কোন তথ্য আবিষ্কার করেন)। তারপর সেগুলি সঙ্গতি-সহকারে বিন্যস্ত ক'রে তিনি রচনা করলেন তাঁর মৌলিক গ্রন্থ 'অষ্টাধ্যায়ী'।

শিব 'পঞ্চবক্ত্র' অর্থাৎ তাঁর পাঁচটি মুখ। কথিত আছে, বিষ্ণুর মহিমা গান করার জন্য শিবের নাকি পাঁচটি মুখ হয়েছিল। আমরা কথায় ব'লে থাকি, অমুক একেবারে পাঁচমুখে অমুকের প্রশংসা করছে। তার মানে, প্রশংসা ক'রে শেষ করতে পারছে না এবং প্রশংসা করতে পেরে নিজে খুবই খুশী। এমন ক্ষেত্রেই ঐরকম পাঁচমুখে কথা বলার বিশিষ্ট বাগ্‌ধারা প্রচলিত আছে। শিবেরও পঞ্চমুখ। পঞ্চমুখে অর্থাৎ প্রাণের সমস্ত ব্যাকুলতা নিয়ে তিনি পরমপিতার কথা ব'লে থাকেন।

তিনি 'ত্রিনেত্র' অর্থাৎ তাঁর তিনটি চোখ। দুটি চোখ যথাস্থানে, আর একটি চোখ দুই ভ্রূর মাঝখানে। কিন্তু সত্যিই তো কপালের উপরে কারো চোখ থাকে না। এটা হল আজ্ঞাচক্র বা প্রজ্ঞানেত্র, সন্তসাধকরা যাকে বলেন দ্বিদল বা তেসরা তিল।

এখানেই ইষ্টমূর্ত্তি ধ্যান করতে হয়। নিরন্তর সুকেন্দ্রিক ধ্যান ও তৎপরিপোষণী চলনের ফলে আজ্ঞাচক্রে ইষ্টের ভাব স্থায়ী আসন লাভ করে। জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন হয়। যার এমনতর হয়, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান তার নখদর্পণে থাকে, বিষয় ও ব্যাপারের কার্য্যকারণ তার অধিগত, চৈতন্য তার উৎস-অভিস্রোতা হ'য়ে ওঠে। ভুল পদক্ষেপ তার হয় না। প্রবৃত্তি তাকে অভিভূত করতে পারে না। অসৎকে বিনায়িত ক'রে জীবজগতের মঙ্গল-সাধনও তার সহজসাধ্য হ'য়ে ওঠে। যিনি নিরন্তর ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠায় তৎপর, অতন্দ্রচিত্তে ইষ্ট-ধ্যান ও কর্ম্মে নিরবচ্ছিন্নভাবে এগিয়ে চলেন, তাঁরই উন্মীলিত হয় এই তৃতীয় নয়ন।

কথিত আছে, শিবের তৃতীয় নয়ন থেকে ক্রোধবহ্নি নির্গত হ'য়ে মদনকে (কামদেবকে) ভস্মীভূত করেছিল। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে শিবের কপালে কোন চোখ নেই, আর সেই চোখ থেকে আগুনও ঠিকরে বেরোয় নি। আসল ব্যাপার হ'ল, মদন মানে কামজ মোহের আকর্ষণ। পার্ব্বতী অপরূপ সাজে সেজে এসে নিজ রূপজ মোহের দ্বারা মহাযোগী

মহাদেবের মন ভুলাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যিনি বৃত্তি-অধীশ, আজ্ঞাচক্রে যাঁর চিত্ত দৃঢ়নিবদ্ধ, তাঁকে কি কামনা দ্বারা অভিভূত করা যায়? মহাদেবের বোধি ও প্রজ্ঞা চিরজাগ্রত। তিনি দেখেই বুঝতে পেরেছিলেন, পার্ব্বতী কামনার ডালি সাজিয়ে এসেছেন তাঁকে বরণ করতে। তাই, তিনি পার্ব্বতীর ঐ ভাবকে প্রশ্রয় দিলেন না। এর ভিতর দিয়ে আর এক মহাসত্য উদ্‌ঘাটিত হ'ল। বিবাহের প্রধান ঘটক হবে শ্রদ্ধা। শ্রেষ্ঠকে বরণ করতে হয় শ্রদ্ধার ভূমিতে। তার পরিবর্ত্তে যদি সেই বরণের ভূমি হয় আত্মসুখ-উপভোগ, তার ফলে দাম্পত্য প্রেম কলুষিত হ'য়ে যায়। সেখানে সুসন্তানের আগমন সম্ভব হয় না। এই কারণেই মহাদেব পার্ব্বতীকে প্রত্যাখ্যান করলেন। এই হ'ল তৃতীয় নয়ন থেকে অগ্নি বিনির্গত হ'য়ে মদনকে ভস্মীভূত করা। পরে পার্ব্বতী কিভাবে মহাদেবের মনের মত ক'রে নিজেকে গ'ড়ে তুলেছিলেন এবং মহাদেবকে পতিরূপে লাভ করেছিলেন সে কাহিনী সবারই জানা।

এ থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, তৃতীয় নয়ন যার সদাজাগ্রত, মন যার আজ্ঞাচক্রে সদা-

নিবন্ধ, প্রবৃত্তির কোন মোহ তাকে কখনও আচ্ছন্ন করতে পারে না। সে প্রবৃত্তিকে প্রবৃত্তি ব'লে চিনতে পারে। তাই, তাকে কখনও দুঃখের কবলে পড়তে হয় না। সে নিজেও আনন্দে থাকে এবং অপরকেও আনন্দ বিলাতে পারে।

শিব-সম্পর্কে ধ্বনি দেওয়া হয় 'হর হর ব্যোম ব্যোম' বা 'ব্যোম বিশ্বনাথ'। আবার, শিবপূজায় গালবাদ্য করা হয়। গালবাদ্যের সময় যে ধ্বনি উত্থিত হয় মুখ দিয়ে, তার শব্দও অনেকটা 'বম-বম-ববম' এর মত। আবার, শিবপ্রণামে আছে 'ওঁ নমঃ শিবায়'। দেখা যায়, এই ওঁ বা ব্যোম-ধ্বনির সাথে শিবের যোগ। সাধনস্তরে এই দুটি বীজই খুব কাছাকাছি। এসব কথা পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রী-ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র নানাসময়ে নানাভাবে আলোচনা করেছেন।

একবার কৃষ্ণপক্ষের এক রাতে ঠাকুর-বাংলার মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর খোলা প্রাঙ্গণে ব'সে আছেন। আকাশের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ ক'রে বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্র এবং তাদের ক্রিয়া ও অবস্থিতি সম্বন্ধে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। চারিদিকে এক গম্ভীর অথচ শান্ত পরিবেশ।

কাছে কয়েকজন উৎসুক অনুরাগী ভক্ত ছাড়া আর কেউ নেই। নিস্তব্ধ সেই নিশীথে বিশ্বপিতা স্বয়ং মহাকাশের সাথে ভক্তবৃন্দের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। তাঁর বাণীর প্রতিটি দ্যোতনা রাত্রির পরদায় আঘাত ক'রে মহাব্যোমে যেন ছড়িয়ে পড়ছে। সে এক অদ্ভুত অনাস্বাদিতপূর্ব্ব রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।

কথাপ্রসঙ্গে, অন্ধকার আকাশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত শ্বেতবর্ণ ছায়াপথটি দেখিয়ে বললেন, "ঐ হ'ল নীহারিকার জগৎ। ওখানে কোটি-কোটি গ্রহ-নক্ষত্র সবসময় সৃষ্টি হচ্ছে, তীব্রগতিতে ছুটে যাচ্ছে, একটার সাথে আর এক-টার ধাক্কা লাগছে, ভাঙছে। এইরকম ক্রিয়ার ফলে ওখানে অবিরাম শব্দ হ'চ্ছে ওঁ-ওঁ। ঐ জন্যেই বলে ব্যোম বিশ্বনাথ।" ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির এক বিশেষ পর্য্যায়ে এই ওঁ-ধ্বনি জেগে উঠছে। তাই, বিশ্বনাথের সঙ্গে ওঁ বা ব্যোম-ধ্বনির সম্বন্ধ অতি নিকট।

সমগ্র বিশ্বের যিনি প্রভু, তিনিই বিশ্বনাথ। তিনি আবার 'বানেশ্বর'ও বটেন। বান মানে বিস্তার। এই বিশাল বিস্তৃতির অধীশ্বর যিনি,

তিনিই বাণেশ্বর।

তন্ত্রশাস্ত্রে আছে, এমনতর গুণান্বিত যে পরম-শিব, তিনি মাঝে মাঝে পৃথিবীতে দেখা দেন ইষ্ট-গুরুরূপে। শিবত্ব ঘনীভূত হ'য়ে প্রকাশ পায় যে ব্যক্তিত্বের মধ্য দিয়ে, তিনিই তৎকালীন লোক-উদ্ধাতা। যখনই তিনি আসেন, মানুষের উচিত কালবিলম্ব না ক'রে তাঁকে স্বীকার করা, গ্রহণ করা ("নাত্র কালবিচারণা"—মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র)। গুরুই সাক্ষাৎ শিব। যে শিবের মহিমা উপরে আলোচনা করা হ'ল, তিনি অব্যক্ত। ঐ সব গুণই যদি কোন পুরুষের মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত হয় তখন আমরা শিবকে বোধে ধারণা করতে পারি, তাঁর বাস্তব রূপ দেখতে পারি। এমনতর ব্যক্তিত্বই প্রকৃত গুরু, মানুষের মঙ্গলবিধাতা। তাই, তাঁকে তুষ্ট করা মানেই শিবকে তুষ্ট করা। তাঁকে বাদ দিয়ে কোন শিবপূজা সার্থক হ'য়ে না। এ সম্বন্ধে চরম কথা লিখছেন তন্ত্র—

"শিবে রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা
গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন।"

অর্থাৎ, শিব, রুষ্ট হ'লে গুরু রাখিবারে পারে,

গুরু রুষ্ট হ'লে শিব রাখিবারে নারে।

সেইজন্য সার কথা হ'ল, যার জীবনে বৈশিষ্ট্য-পালী আপূরয়মাণ সদ্‌গুরু লাভ হয়েছে এবং যে অচ্যুত নিষ্ঠাসহ তাঁর অনুসরণ ক'রে চলেছে তার শিববোধ জাগ্রত হয়, শিবপূজা সার্থক হয় তারই।

শিবপূজা করলে, শিবের অভিপ্রেত চলনে চললে, মানুষ মৃত্যুভয় থেকে ত্রাণ লাভ করে। 'মৃত্যুঞ্জয়' শিবের আর এক নাম। শিব-উপাসনা যে ঠিকমত করে, তার অন্তর হ'য়ে ওঠে অভী-ভাবনায় উজ্জীবিত। প্রকৃত ধর্ম্মাচরণই মানুষকে 'অভী' বা ভয়শূন্য ক'রে তোলে। তথাকথিত হাজার রকমের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভয় বা আতঙ্ক তাকে সঙ্কুচিত ও ত্রস্ত ক'রে তুলতে পারে না। সে জানে শরীরের বিনাশ হ'লেও আত্মার বিনাশ হয় না। আত্মা চির-অবিনশ্বর এবং প্রতিটি মানুষই সেই বিশ্বাত্মারই অংশবিশেষ। সদ্‌গুরুর উপর গভীর টান মানুষকে এমনতর মৃত্যুভয়-অতিক্রমী সাহসী অথচ কল্যাণপথিক ক'রে তোলে।

কথিত আছে, শিব অতিশীঘ্র (আশু) পরিতুষ্ট হন বলে তাঁর আর এক নাম 'আশুতোষ'। ভক্তের ডাকে তিনি নাকি তাড়াতাড়ি সাড়া দেন। তাই

কি ঠিক? না, এর মধ্যে একটু রহস্য আছে। শুধু মুখের ডাকে তাঁর সাড়া পাওয়া যায় না। তিনি ব্যক্ত হন গুরুরূপে। গুরুকে খুশী করার ধান্ধা যার অন্তর জুড়ে থাকে, তার উপরেই তিনি তুষ্ট হন। এই চলন যার যত বেগবান, সে তত শীঘ্র শিব-প্রসাদ লাভ ক'রে থাকে।

ভারতে এবং বহির্ভারতে বহুস্থানে শিব-উপাসনা প্রচলিত আছে। শিবের উপাসকগণ 'শৈব' নামে পরিচিত। শিব কোথাও নাগভূষণ, বাঘছাল পরিহিত, জটাত্রিশূলধারী রূপে পূজিত হন, কোথাও বা তাঁর লিঙ্গপূজা হয়। লিঙ্গমূর্ত্তি আবার দেখা যায় যোনিপীঠের উপর প্রতিষ্ঠিত। এমনতর রূপকল্পনা কেন? এর দ্বারা কী বুঝানো হ'চ্ছে? একটু আলোচনা ক'রে দেখা যাক।

'ফেলিক' বা এই লিঙ্গাবয়ব সৃষ্টিতত্ত্বকেই সূচিত করছে। সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন হয় পজিটিভ্ ও নেগেটিভ্-এর সংযোগ। পুরুষ 'পজিটিভ্', নারী বা প্রকৃতি 'নেগেটিভ্'। শিবলিঙ্গের সংগঠন, মনে হয়, পজিটিভ্-নেগেটিভের সম্মিলনের ভিতর দিয়ে সৃজন-প্রগতিরই দ্যোতক।

শিবরাত্রিতে বা বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে শিবলিঙ্গের মস্তকে জল ঢালার প্রথা আছে। পাঠক! লক্ষ্য করুন। এই জল ঢালার ব্যাপারটা কিন্তু শিবের পূর্ণাবয়ব-মূর্ত্তিতে বা অন্য কোন পট-প্রতিকৃতিতে হ'চ্ছে না, ঐ লিঙ্গমূর্ত্তিকেই জলধারা দ্বারা স্নান করানো হয়। কেন? কারণ, লিঙ্গমূর্ত্তি হ'ল 'সেক্স্' বা যৌনজীবনের প্রতীক। লিঙ্গমূর্ত্তির উপরে শীতল জলধারা বর্ষণ করার অর্থ যৌনজীবনকে শান্ত রাখা। যৌনজীবন যার অশান্ত এবং উগ্র, সে নিজেও দুঃখভোগ করে, পরিবেশকেও বিব্রত ও বিষাক্ত ক'রে তোলে। তা' ছাড়া, যৌনজীবন শান্ত ও সংযত থাকলে মানুষের জীবনীশক্তি বৃদ্ধি পায়। আর উচ্ছৃঙ্খল বিক্ষুব্ধ যৌনজীবন জীবনীশক্তিকে ক্ষীণ ও ম্রিয়মাণ ক'রে তোলে। তাই, শিবলিঙ্গে জল ঢালার তাৎপর্য্য মনে হয়, ব্যক্তিগত তথা জাতিগত যৌনজীবনকে সুস্থ, শান্ত ও সুনিয়ন্ত্রিত রাখা।

শিবলিঙ্গের মাথায় ঘড়া-ঘড়া জল ঢেলে আমি যদি অবৈধ যৌনাচারে লিপ্ত থাকি তাহ'লে ঐ জল ঢালার কোন সার্থকতাই জীবনে ফুটে ওঠে না।

সাময়িক একটা উন্মাদনা-বশে ঐ পূজা করি বা জল ঢালি, তারপর আবার যে-কে সেই। এইজন্য লক্ষ-লক্ষ লোক আজ শিবপূজা করে বটে, কিন্তু তাদের জীবন শিবভাবদীপ্ত বা কল্যাণ-কলোচ্ছল হ'য়ে উঠতে পারছে না।

আমাদের দেশের কুমারী মেয়েরা শিবরাত্রিব্রত করে। উদ্দেশ্য কী? কল্যাণলাভ এবং শিবের মত স্বামী পাওয়া। তাই, শিবরাত্রিতে তারা সারাদিন না-খেয়ে না-ঘুমিয়ে সন্ধ্যার পরে পূজা-উপকরণ নিয়ে যেয়ে শিবের মাথায় জল ঢেলে আসে। তাতেই কি ব্রতের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়? সিদ্ধ হ'লে তো শিবের বরে শিবতুল্য স্বামীই পাওয়া উচিত। কিন্তু বাস্তবের চিত্র—সবার ক্ষেত্রে না হ'লেও কারো কারো ক্ষেত্রে—অন্যরকম হ'য়ে দাঁড়ায়। কোন মেয়ে হয়তো এমন স্বামী পেল, যে তার জীবন তিক্ত ক'রে তুলল। তখন মিষ্টিঝরা বিবাহ-রাতের মধুর স্বপ্ন অচিরেই মিলিয়ে যায়। অশান্তির আগুনে দুজনেই জ্ব'লে-পুড়ে খাক্ হ'তে থাকে।

এমনটা হয় কেন? কারণ, কতকগুলি মন্ত্রপাঠ হয়তো করা হয়েছে, পূজার উপচারও সাধ্যমত

দেওয়া হয়েছে, অনুষ্ঠানের আড়ম্বরেরও খাঁকতি নেই, কিন্তু ব্রত বলতে যা' বোঝায় তা' করা হয়নি।

ব্রত-শব্দটি এসেছে বৃ-ধাতু থেকে, অর্থ বরণ করা। শিবব্রত করা মানে শিবত্বকে বরণ করে নেওয়া, শিবকে আপন ক'রে নেওয়া। আর তা' বছরে ঐ একটিমাত্র দিনের জন্য নয়, সারাজীবনের প্রতিটি মুহূর্ত্তে। আর, ব্রত-শব্দের আর একটি উৎপত্তি হ'ল ব্রজ্-ধাতু থেকে, অর্থ চলা। শিব-রূপী সদ্‌গুরু যেমন চান সেইমত চলা, বলা ও করা থাকলেই ব্রত সার্থক হয়। সংকল্প নিতে হয়, 'তিনি যা' পছন্দ করেন তাই করব এবং তাঁর যা' অনভিপ্রেত তা' কিছুতেই করব না'। এ না ক'রে, না খেয়েদেয়ে শিবের মাথায় হাজার ঘড়া জল ঢাললেও শিব অর্থাৎ মঙ্গল-লাভ কিছুতেই হবে না। আজকাল ঠিকমত তাৎপর্য্য বুঝে পূজাবিধি অনু-সরণ করা হয় না ব'লে এইসব পূজা-অনুষ্ঠান কেবল সাময়িক একটা উন্মাদনার সৃষ্টি করছে মাত্র, জনজীবনে স্থায়ী কল্যাণ কিছু আনতে পারছে না।

এইতো গেল ব্রত সম্বন্ধে কথা। তারপর দেখা যাক উপবাসই বা কতখানি ঠিকমত হয়।

সারাদিন কিছু না-খেয়ে থাকাটাকেই অনেকে উপবাস (চলতি কথায় 'উপোষ') করা ব'লে মনে করেন। কিন্তু উপবাস মানে তা' নয়। আহার-সংযমের দ্বারা শরীরটা হালকা থাকে, কাজ বেশী করতে পারা যায় এবং মনও একাগ্র করতে সাহায্য হয়। এইসব উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'তে পারে। তাতে উপবাস করা নাও হ'তে পারে। 'উপ' মানে নিকটে, উপবাস মানে নিকটে বাস করা। এখন যাঁর নিকটে আমি থাকতে চাই, আমাকে অবশ্যই তাঁর মনের মত হ'য়ে থাকতে হবে। তা' না হলে আমি তাঁর অস্বস্তি উৎপাদন করব, প্রীত হবেন না তিনি। ঠিক তেমনি শিবসান্নিধ্যে থাকতে গেলেও মনটা শিবমুখী ক'রে একাগ্র ক'রে রাখতে হয়। সব সময়ই ভাবতে হয়, আমি শিবের চরণ-তলেই ব'সে আছি। তাই, তিনি যেমন পছন্দ করেন আমাকে তেমনিভাবে চলতে হবে, বলতে হবে, করতে হবে। তাই, মোট কথা হল, শিব-ভাবের পরিপোষণ যা'তে হয় তেমনতর আহার, বিহার, আলাপ, ব্যবহার ক'রে চলতে পারলে তবেই শিবের উপবাস করা হবে।

নারীই হোক আর পুরুষই হোক, যারাই এই ব্রত উপবাস ঠিকমত করে, অন্তর তাদের হ'য়ে ওঠে শুদ্ধ, শান্ত, মঙ্গল-বিকিরণী। তাদের জীবনে লালসার উগ্রতা স্তিমিত হ'য়ে আসে। প্রত্যেকেই তার বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী হ'য়ে ওঠে মহাযোগী মহাদেবের এক একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ। আর, এই হওয়া অনুপাতিক প্রাপ্তিও ঘটে প্রতিপ্রত্যেকের জীবনে। কথায় আছে—

যেমন কর তেমনি হয়,
বিধি কা'রো বাম নয়।

দুর্গা

দেবদেবীর মধ্যে দুর্গাদেবী সম্বন্ধে আলোচনা শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্নিধানে তুলনামূলকভাবে বেশি হয়েছে। তার একটি প্রধান কারণ—বাংলা ১৩৫৫ সাল থেকে শুরু করে প্রতি বছর বিজয়া-উপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুর আশীর্বাণী দিতেন। ঐ আশীর্বাণীগুলির মধ্যে দিয়েই তিনি নানারকমে ব্যক্ত করেছেন শারদীয়া পূজার প্রকৃত রহস্য, জগন্মাতার প্রকৃত স্বরূপ।

বিজয়া-দশমীর পরের দ্বাদশী থেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদপীঠতলে অনুষ্ঠিত হয় তাঁর জন্ম-মহোৎসব। ঐ উৎসবে বিজয়া-উপলক্ষে প্রদত্ত আশীর্বাণী নিয়মিত পাঠ হ'য়ে আসছে। দুর্গাপূজার প্রাক্কালে শ্রীশ্রী-ঠাকুরের কাছে আশীর্বাণীর জন্য প্রার্থনা জানানো হ'ত। প্রবীণ ভক্তবৃন্দ এসে বসতেন লেখা শুরু হওয়ার আগে। দু'-তিনখানা সংস্কৃত ও বাংলা অভি-ধান কাছে থাকত। বোধন, দুর্গা, ভগবতী, বিজয়া, প্রভৃতি শব্দের অর্থ জানতে চাইতেন শ্রীশ্রীঠাকুর। জ্ঞানতাপস ভক্তগণ সেসব শব্দের আভিধানিক অর্থ

বলতেন, আর গল্প করে বলতেন ঐ শব্দটির উৎপত্তির সাথে জড়িত বিবিধ কাহিনী। এসব শুনতে শুনতে বিশ্বেশ্বরের মধ্যে ঘনীভূত হ'য়ে উঠত মহাভাব। তারপর এক সময় ঝরঝর ক'রে নেমে আসত আশীর্বাণী।

ভক্তগণ যখন শব্দের অর্থ বলতেন, সেগুলি তাঁদের বলতে হ'ত ধাতুগত অর্থের উপর দাঁড়িয়ে। শ্রীশ্রীঠাকুর সব সময় ঐ অর্থটাই চাইতেন। কারণ, ধাতুগত অর্থের মধ্যেই নিহিত থাকে শব্দের প্রাথমিক তাৎপর্য্য। অভিধানগুলি প্রধানতঃ এই কাজেই ব্যবহার হ'ত।

কোন কোন বারে, আলোচনা শুরু হবার কিছুক্ষণ পরই শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখা যেত নীরব ধ্যানগম্ভীর ভাবে অবস্থান করতে। অর্থাৎ তখনই মহামায়া-সম্পৃক্ত ভাবরাশি তাঁর চিদ্‌জগতে তরঙ্গ সঞ্চার করতে আরম্ভ করেছে। তারপরই তাঁর শ্রীমুখ থেকে আগলভাঙ্গা স্রোতের মত নির্গত হ'তে থাকত আশীর্বাণী—তার মহনীয় ভাব, ভাষা, ছন্দ ও অনুরণন নিয়ে। কখনও আবার দু'তিনদিন ধ'রে হয়ত চলছে দুর্গাপূজা-সংক্রান্ত আলোচনা। তারপরে এক বিশেষ

ক্ষণে ঝপ ক'রে নেমে আসত ছন্দোময় বাণীর প্রবাহ। প্রতিটি আশীর্বাণীই যেন একটি পূজার মন্ত্র; মহামায়ার মহিমা সেখানে উচ্ছল নন্দনায় পরিব্যক্ত।

শ্রীশ্রীঠাকুর মা-দুর্গাকে কখনও মাটির প্রতিমা হিসাবে দেখেননি। তিনি বলেন, প্রতিমায় যাঁকে পূজা করা হয়, তিনি প্রতি ঘরের দেহধারী মা। তার মানে, নিজের মায়ের উপর ভক্তি-ভালবাসা যার যত জীবন্ত, তার কাছে দুর্গাপূজার সার্থকতা তত বেশী। নিজের মাকে খুশী ও তৃপ্ত না ক'রে হাজার ঢাক-ঢোল বাজিয়ে দুর্গাপূজা করলেও কোন ফল ফল হয় না। দয়াল ঠাকুর শ্রীঅনুকূলচন্দ্র তাই বলেছেন—

"ভগবতীপূজা করি, তার মানে—
নিজের মাকেই উপাসনা করি।"

তিনি শুধু পূজার বেদীতে দশভুজা প্রতিমা নন, ঘরে ঘরে জীবন্ত দ্বিভুজা জননী। প্রতিটি ঘরের মা জগতের মায়েরই একটি রূপ।

মা-দুর্গা 'দশভুজা', মানে তাঁর দশ হাত। অথচ ঘরের মা যিনি তাঁর তো দুই হাত। তাহ'লে এই

দশ হাতের তাৎপর্য্য কী? তার মানে, তিনি দুই হাতে দশ হাতের কাজ করেন। যিনি মা, তিনি একাধারে ঘরের বধূ ও গৃহিণী। স্বামী-সন্তান সহ পরিবারের প্রতিটি মানুষের জন্যই তাঁকে সর্বদা তৎপর থাকতে হয়। এদের সোয়াস্তি ও খাওয়াদাওয়ার দায়িত্ব তাঁরই হাতে। যার যেমন দরকার, তিনি তার তেমনি আহারের ব্যবস্থা করেন। গুরুজনদের সেবাযত্ন করেন। ছোটদের শিক্ষা, লালন-পালন ও ভালোমন্দের দিকে নজর রাখেন। তাছাড়া, বাইরের আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধব বাড়িতে এলে তাদের সুখসুবিধা দেখা ও যথাবিহিত পরিচর্য্যা করা তাও তাঁকেই করতে হয়। এই সমস্ত কিছু বজায় রেখেও সংসারে একটু সাশ্রয় কিভাবে করা যায় তারও চেষ্টা তাঁর থাকে। এইভাবে গৃহস্থালীর সব দিকে সমানভাবে লক্ষ্য রেখে সব কাজ সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে ক'রে চলেন যে মা, চলতি কথায় তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়, তিনি যেন দুই হাতে দশ হাতের কাজ করছেন। এই হ'ল দশ হাতের তাৎপর্য্য। সেইজন্য পূর্ণ নারীত্বের প্রতীক মা-দুর্গাকে আমরা দশভুজারূপে দেখতে পাই, যা কিনা প্রতি ঘরের প্রতিটি মায়েরই স্বরূপ বা

প্রকৃতি।

মায়ের দশ হাতে ত্রিশূল, পাশ, পরশু, ধনুর্ব্বাণ প্রভৃতি দশ রকম অস্ত্র। তাই তিনি 'দশপ্রহরণ-ধারিণী'। এ অস্ত্রগুলি কী? এগুলি সবই মাতৃ-ঐশ্বর্য্যের বিভিন্ন শক্তি, যা' দিয়ে মা অসৎ বা অসুরশক্তিকে পরাভূত ও প্রতিহত করেন; ক'রে স্বীয় সন্তানগণকে রক্ষা করেন। তাঁর এই রূপ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন—

"দুর্গতিনাশিনী হ'য়ে
দশপ্রহরণ ধারণ ক'রে
সন্তান-সংরক্ষণায় নিয়োজিতা।"

ক্ষেপণার্থক অস্-ধাতু থেকে অস্ত্র-শব্দটি উৎপন্ন। সেইজন্য অস্ত্র মায়ের অঙ্গভূষণ মাত্র নয়। এগুলি তিনি অসুর-দলনার্থে ক্ষেপণ অর্থাৎ প্রয়োগ করেন। তার মানে, অসুর-প্রকৃতিসম্পন্ন লোকদের প্রতি শক্তি-প্রয়োগ ক'রে মা তাদের অন্তরের অকল্যাণকারী ঝোঁককে রুদ্ধ তথা বিনায়িত করেন। তাই তিনি 'অসুরদলনী'।

এক এক রকম অসুরের বিরুদ্ধে এক এক জাতীয় অস্ত্রের প্রয়োগ হয়। চণ্ড, মুণ্ড, শুম্ভ, নিশুম্ভ,

মহিষাসুর প্রভৃতি অসুরের দলকে দমন করেছেন মা-দুর্গা। এই অসুর কে বা কারা? গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অসুর-প্রকৃতিদের চরিত্র অতি সুন্দরভাবে বিবৃত করেছেন। সেখানে তিনি বলেছেন, অসুর-প্রকৃতিদের থাকে দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা এবং অজ্ঞানতা। তাদের শুচিতা, আচার এবং সত্যনিষ্ঠা নেই। তারা বর্তমানের সুখ-ভোগ নিয়েই ব্যস্ত থাকে। তারা অর্থসঞ্চয় করে কেবল কামনার উপভোগের জন্য। অসুররা নিজ-দিগকে সকলের প্রভু ও কম-বেশী সিদ্ধপুরুষ ব'লে মনে করে। তারা নিজেদের সব সময় বলবান ও সুখী ভাবে। তারা মনে করে তাদের সমান আর কেউ নেই। তারা বিভ্রান্তচিত্ত, মোহাচ্ছন্ন এবং ঐশীপুরুষে বিদ্বেষপরায়ণ।

এমনতর অসুর-স্বভাবসম্পন্ন মানুষদিগকে মা নিয়ন্ত্রিত করেন, তাদের সত্তাবিরোধী চলনগতিকে নিরুদ্ধ করেন। তাই তিনি 'অসৎদলনী', 'অসুর-নাশিনী'। যেসব মানুষ তাঁর শরণাগত হয়, তাঁকে ভক্তি করে, তাঁকে ভালবেসে সবাইকে ভালবাসতে পারে, তাদের জীবন শুভে নিয়ন্ত্রিত হয়, অকল্যাণ

তাদের স্পর্শ করতে পারে না। আর যারা অহংকারবশে তাঁকে অবজ্ঞা করে, আত্মস্বার্থ-পরিপূরণে মগ্ন থেকে পরিবেশ সম্বন্ধে কোন চিন্তা করে না, সর্বদা নিজ সুখভোগ নিয়েই ব্যস্ত, তারা বৃত্তির পাশে শৃঙ্খলিত হ'য়ে পড়ে। অবশেষে মহাকালের অমোঘ বিধানে তারা বিধ্বস্ত ও নিহত হয়।

মহিষাসুর বধ করেছিলেন বলে মায়ের এক নাম 'মহিষমর্দিনী'। মহিষমর্দিনী মানে শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন, তিনি 'আত্মম্ভরিদম্ভ-বিজয়িনী'। অসুরের থাকে অপরকে বঞ্চিত ক'রে নিজের ভোগসুখের ধান্ধা। তার জন্য সে পারিপার্শ্বিককে তার লোভ ও হিংসার শিকার ক'রে জর্জরিত ক'রে তোলে। মা তাদের এই ভাবকে সংযত ও নিরস্ত করেন। ক'রে, তিনি সবাইকে অসুরের উৎপীড়ন ও অত্যাচার থেকে রক্ষা করেন। অভয় দান করেন জীবকুলকে। তাই তিনি 'অভয়া'। তিনি বলেন, 'ভয় নেই, তোমরা বাঁচাবাড়ার নীতিগুলি ধ'রে চল। তাহ'লেই তোমরা নির্ভয় হ'তে পারবে।'

মায়ের শরণ নিলেই মানুষ অভয় হ'তে পারে। শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র তাঁর জীবনের একটি গল্প

করতেন। একদিন রাতে তিনি স্বপ্ন দেখছিলেন যে একটি মেয়েলোক তাঁর কাছে এসেছে এবং নানারকম অঙ্গভঙ্গী ক'রে ও কথা ব'লে তাঁকে অসৎপথে প্রলুব্ধ করতে চাইছে। শ্রীশ্রীঠাকুর যত তাকে চ'লে যেতে বলছেন, মেয়েটি তত নাছোড়বান্দা হ'য়ে এগিয়ে আসতে চাইছে। তখন শ্রীশ্রীঠাকুর স্বীয় জননী-দেবীকে স্মরণ ক'রে 'মা', 'মা' ব'লে আকুল স্বরে ডেকে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে মাতা মনোমোহিনী দেবী সেখানে আবির্ভূতা হলেন। তাঁকে দেখে ঐ মেয়েলোকটি পালিয়ে গেল।

গল্পটির ভিতর দিয়ে তিনি কী শেখালেন? মায়ের উপর অটুট টান থাকলে তথাকথিত কামনা-বাসনার প্রলোভনে প'ড়ে নাকানি-চুবানি খেতে হয় না। চরম নোংরামির মধ্যে পড়লেও সন্তান যদি তখন মায়ের স্নেহমধুর বরাভয় মুখখানি স্মরণে রাখতে পারে তাহলে সেসব নোংরা আকর্ষণ মুহূর্তে ছিঁড়ে ফেলতে পারে। মা তখন সন্তানের কাছে হ'য়ে দাঁড়ান অসৎ-এর বিরুদ্ধে দুর্গস্বরূপ। সেইজন্যেই তিনি 'দুর্গা' নামে অভিহিত। একবারের বিজয়া-উপলক্ষে প্রদত্ত বাণীতে বলেছেন দয়াময় শ্রীশ্রীঠাকুর—

"এই মা আমার
এমনতর ঐশ্বর্য্যশালিনী
দশপ্রহরণী
যাঁতে অচ্যুত আনতিই আমার দুর্গ—
সেই আনতির মধ্যে দিয়ে
যখন মার চরণে আনত হই
স্বতঃসম্বিতে
সক্রিয়তায়—
তখনই মা আমার দুর্গতিনাশিনী দুর্গা।"

সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ। এই মানুষের মধ্যে পশুভাবও আছে, দেবভাবও আছে। ঈশ্বরপ্রদত্ত শক্তি ও যোগ্যতা মানুষ যখন লোককল্যাণার্থে ব্যবহার করে, তখন সে হ'য়ে ওঠে দিব্য চরিত্রের অধিকারী, দেবতা। আর সেগুলি যখন অসৎ-উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে, তখন মানুষ হয় পশুর মত। সমাজে-সংসারে যদি পশুভাব প্রাধান্য পায় তবে সমাজ অচল হ'য়ে যাবে, মনুষ্যত্বের বুনিয়াদ ধ্ব'সে যাবে। অতএব করণীয় কী? তারই আদর্শ যেন মূর্ত হ'য়ে উঠেছে দুর্গা-প্রতিমায়। মা সিংহবাহিনী। মহাপরাক্রমী পশুরাজের পৃষ্ঠে তাঁর চরণ ন্যস্ত। তার মানে

পশুভাবের উপরে চাই মাতৃভাবের প্রতিষ্ঠা। নারী-জীবনেরও আদর্শ এই। মানুষের যদি তার মায়ের উপর অগাধ টান থাকে, তখন সে সব অশিষ্টতা, সব অনাচার, সব অকল্যাণকে পরাভূত ক'রে চলতে পারে। তথাকথিত হীন পাশবিক প্রবৃত্তির শিকার তাকে কখনও হ'তে হয় না। আবার, মাকে খুশী করার টানে জীবনের কোন বাধাই তার কাছে বড় হ'য়ে দাঁড়ায় না। মায়ের প্রতি জ্বলন্ত ভক্তি কী করে সে সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র বলেছেন—

"অশিষ্ট যা'
তাকে দূর করে দেবে,
শিষ্ট যা'
তাকে সংহত ও সুষ্ঠু ক'রে
অসৎকে মোচন ক'রে তুলবে।"

দুর্গাপূজা শরৎকালে হয় ব'লে মা-দুর্গার আর এক নাম 'শারদা'। একবার বাণীপ্রদানের আগে শ্রীশ্রীঠাকুর শারদা কথার মানে জানতে চাইলেন। বলা হল, শরৎকালে পূজা হয় বলে তিনি শারদা। কিন্তু কারণপুরুষ যিনি তিনি শুধু শব্দার্থ শুনে তৃপ্ত নন। তিনি বিষয়ের মূল কারণকে ধরতে

শেখান। তাই আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "কোন্ ধাতু থেকে হয়েছে?" অভিধান দেখে বলা হ'ল শারদা বা শরৎ এসেছে শৃ ধাতু থেকে, অর্থ বধ ও হিংসা। শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর যেন আশ্বস্ত হলেন। এক-গাল হাসির ঝলক ছড়িয়ে দিয়ে বললেন, "ঐ তো, ঠিক হয়েছে। তিনি অসৎনিরোধী প্রচণ্ডা। হিংসা-ত্মক যা-কিছুকে নিহত করে তিনি রক্ষাকে সম্বুদ্ধ করে তোলেন।" দুর্গার ধ্যানমন্ত্রেও আমরা পাই তাঁর অষ্টশক্তির কথা—উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডা, চণ্ডবতী, চণ্ডরূপা, অতিচণ্ডিকা। এই সবগুলিই হ'ল অসৎ-এর বিরুদ্ধে মহাপরাক্রমী শক্তি। মায়ের 'শারদা' নামের সার্থকতা এইখানে।

অসৎ-এর বিরুদ্ধে মা যেমন প্রচণ্ডা, নিজ সন্তা-নের কাছে কিন্তু 'আনন্দময়ী'। মাকে দেখলেই শিশু আনন্দে ডগমগ হ'য়ে ওঠে। মা যদি মারেন, তাহ'লে শিশু কাঁদতে কাঁদতে আবার ঐ মায়ের কাছেই যায়। সে জানে, তার সব জ্বালা জুড়াবার জায়গা ঐ একটিই। মাতৃভাব, মাতৃস্নেহ প্রতিটি জীবকেই নন্দিত ক'রে তোলো।

তিনি শিবের ঘরণী, 'শিবানী' অর্থাৎ মঙ্গল-

বিধায়িনী। মা নিত্যই সন্তানের মঙ্গল কামনা করেন। যে সন্তানটি অবাধ্য, মায়ের কথা শোনে না, তার জন্যও থাকে মায়ের চিন্তা। তিনি কাউকে ফেলে দেন না। সবার ভাল করেন। সবাইকে তাঁর কোলে আঁকড়ে রাখতে চান। তাই তাঁকে বলা হয় 'জগদ্ধাত্রী'।

জগদ্ধাত্রী-অভিধার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পরম দয়াল শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন, "তিনি বিক্ষুব্ধতা ও বিচ্ছিন্নতাকে সুসংশ্লিষ্ট করে তোলেন।" আবার বলছেন—

"মা সবারই মা,
কাউকে ছেড়ে নয়,
কাউকে বাদ দিয়ে নয়,
কাউকে পরিত্যাগ করে নয়।"

এই হ'ল মায়ের স্বভাব-প্রকৃতি। তিনি যেন জীবজগতের একত্ববিধানের এক দম্বলস্বরূপ। সব সন্তান যেমন মায়ের নাড়ীছেঁড়া ধন, তেমনি সেই সন্তানরা যদি আবার মায়ের তৃপ্তি ও স্বস্তি বিধান করতে আগ্রহান্বিত হয়, তাঁকে ভালবাসে, তাঁর সেবা করে, তখন সেই সন্তানরাও আবার পারস্পরিক সম্প্রীতি নিয়ে মিলেমিশে থাকতে পারে। তাদের

মধ্যে বিক্ষোভ বা বিচ্ছেদ মাথা চাড়া দিতে পারে না।

মাকে ভালবাসলে মায়ের স্নেহভাজন যারা তাদের উপরেও আপনা থেকেই ভালবাসার সৃষ্টি হয়। মায়ের প্রিয়পাত্রকে ভালবাসলে মা খুশি হবেন, এই চেতনাই মানুষকে তার পরিবেশ সম্বন্ধে সজাগ ও সাড়াপ্রবণ ক'রে তোলে।

তাই, দুর্গাপূজা কেবলমাত্র পুষ্পবিল্বপত্রের এবং ঢাকঢোলের পূজা নয়। এ পূজা মানবতার এক বিরাট মিলন-উৎসব। মাতৃ-আরাধনায় রত যারা তাদের উদ্দেশ্য ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর এক জায়গায় বলেছেন—

"সব জেনো তুমি,
আর সব তোমারই তোমাতে।"

এমন ভাব থাকলেই পূজার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। সবাইকে নিয়ে উদ্বর্দ্ধনার পথে এগিয়ে চলা। প্রতিমাকে পুতুল মনে ক'রে পূজা করলে পূজার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। পূজার অনুষ্ঠাতাদের সচেতন ক'রে দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—

"মা এলেন,
পুতুলের মতন তাঁকে পূজা করলে

আমাদের প্রাণে তাঁর প্রতিষ্ঠা হল না,
সে পূজা কি সম্বর্ধনা নিয়ে আসতে
পারে ?"

দেবতাকে মাটি বা পাথরের পুতুল ভাবতে ভাবতে অন্তরটাও ঐরকম মাটি বা পাথর হ'য়ে ওঠে। দেবতার পছন্দ-অপছন্দ, সুখ-দুঃখ সম্বন্ধে আমাদের কোন বোধ গজায় না। তাই তাঁর দেবভাব অনুধাবন করার কোন ঝোঁকও আসে না, সম্বর্ধনাও স্তব্ধ হয়ে যায়। সে পূজা হয় খেয়ালের পূজা—কতকগুলি প্রাণহীন অনুষ্ঠান ও আঙ্গিকের সমষ্টিমাত্র।

পূজার সময় প্রতিমার চক্ষুদান ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হয়। তার মন্ত্রও আছে। ঐ মন্ত্র পাঠ ক'রে করণীয় অনুষ্ঠান করলেই দেবতার চোখ ফুটল, প্রতিমা প্রাণ পেলেন। কিন্তু এই ব্যাপারটা কি আমরা সত্যিই বোধ করি ? যদি করি তাহ'লে সেই প্রতিমার সামনে অশালীন আচরণ করি কী ক'রে, প্যাশন-জাগানো গানের রেকর্ড চালাই কী ক'রে, কী ক'রেই বা অবান্তর কথা বলি ? কোন জীবিত গুরুজন বা মা-মাসীর সামনে আমরা অশ্লীল ব্যবহার করি বা যা' তা' কথা ব'লে থাকি ? তা' তো করি

না। কেন? কারণ, আমরা বিশ্বাস করি তিনি সামনে আছেন। আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। তেমনি দেবতাকেও যদি আমরা প্রাণবন্ত মনে করতাম তাহ'লে তাঁর সম্মুখে কথায়, কাজে ও ব্যবহারে অবশ্যই সংযত হতাম। সেইজন্য ঐ চক্ষুদান বা প্রাণপ্রতিষ্ঠার কাজ একটা অনুষ্ঠানমাত্রে পর্য্যবসিত হয়েছে। প্রকৃত চক্ষুদান বা প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়ই না।

প্রকৃত চক্ষুদান হ'চ্ছে আমার চক্ষু তাঁর চক্ষুতে দান করা। আমার চক্ষু যেন তাঁরই চক্ষু হ'য়ে ওঠে সেইভাবে চলা। তিনি ব্যক্তি, বিষয় ও ব্যাপারকে যেমনভাবে দেখা পছন্দ করেন, আমি যেন সেইভাবে দেখতে অভ্যস্ত হই। আর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হ'ল দেবতাকে পূজকের প্রাণে প্রতিষ্ঠিত করা। দেবতার দিব্য গুণরাজি অনুশীলনের ভিতর দিয়ে নিজ নিজ চরিত্রে ফুটিয়ে তোলা। এমনতর হ'লে তবেই চক্ষুদান ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা ঠিকমত হয়। গুরুপুরুষোত্তম যখনই আবির্ভূত হন, তিনি দেবতাকে এইভাবে জীবনে জীবন্ত ক'রে তুলতে শেখান।

অপূর্ব এক কাহিনী আমরা পাই পরম পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনে। রাণী রাসমণির প্রতিষ্ঠিত

বিগ্রহের যখন পা ভেঙে গেল, শাস্ত্রজ্ঞ বিধানদাতারা বললেন, ভগ্নমূর্তির পূজা হয় না, এ মূর্তি ফেলে দিয়ে নতুন মূর্তির প্রতিষ্ঠা ক'রে পূজা করতে হবে। কিন্তু এ বিধান রাসমণির মনোমত হচ্ছে না। এতকালের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহকে গঙ্গায় ফেলে দিতে তাঁর কষ্ট হচ্ছে। শেষ পর্য্যন্ত তিনি এলেন মন্দিরের পুরোহিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে। রাসমণির প্রাণের ব্যাকুলতা দেখে ঠাকুর দিলেন এক অচিন্ত্যনীয় বিধান। প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহকে পুতুলমাত্র ভাবার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা ক'রে তিনি বললেন রাণীমাকে, 'তোর জামাইয়ের যদি পা ভেঙে যায় তাহ'লে তুই কি তাকে গঙ্গায় ফেলে দিয়ে একটা নতুন জামাই ঘরে আনবি ?' কী চমৎকার আপন-করা বিধান। দেবতা যেন ঘরের ছেলে। তারপর আবার বললেন, 'মূর্তিটা আমাকে দিস্। আমি ঐ ভাঙ্গা-পা এমনভাবে জুড়ে দেব, কেউ টের পাবে না।' দেবতা সম্পর্কে এমনতর ভাবনা যাঁর তাঁর কাছেই ত' মৃন্ময় মূর্তি চিন্ময় হ'য়ে ওঠেন। পূজাও অর্থসমন্বিত হয় সেখানে।

অনেকে বলেন, বৃহত্তর কাজ করতে গেলে ক্ষুদ্র

ঘর-সংসারের দিকে বেশী নজর দিতে গেলে চলে না। এই কথা ব'লে তাঁরা স্বীয় গর্ভধারিণী জননীর প্রতি যেটুকু কর্তব্য তা' করেন না। তাঁদের কারো কারো কথা—দেশমাতৃকার সেবা করতে গেলে নিজের মায়ের প্রতি দৃষ্টি একটু কম দিতেই হয়। কিন্তু শাশ্বত ভাগবত বিধান এই যে, নিজের মাকে যে ভালবাসতে পারে না, নিজের মায়ের দুঃখমোচনে যে তৎপর নয়, সে দেশের দুঃখ ঘোচাবে কী ক'রে? মাতৃভাবে উদ্দীপিত না হ'য়ে দেশের সেবা করতে গেলে সেখানে স্বভাবতঃই জেগে ওঠে লোভ, স্বার্থপরতা, হিংসাশ্রয়ী মনোভাব, অপরকে বঞ্চিত ক'রে নিজে বড় হওয়ার প্রবণতা, ইত্যাদি। কারণ, মায়ের স্নেহ, আদর, মমতা, কষ্টসহিষ্ণুতা, নিঃস্বার্থ ভালবাসা, সহ্যশক্তি, এইসব সদ্‌গুণের পরিচয় তো সে কখনও পায় নি। তার নিজের জীবনে এসবের অনুশীলনও নেই। ঐগুলিই তো মানুষকে বড় ক'রে তোলে। আর, সদ্‌গুণের যেখানে অভাব, অসদ্‌গুণের সেখানে প্রাদুর্ভাব আপনা থেকেই হবে।

দুনিয়ার সবাইকে ও সব-কিছুকে নিয়েই মা আমাদের মহামায়া। বিশ্বপ্রসবিনী ব'লে তিনি জন-

গণমনে পূজিতা। দুনিয়ার সব-কিছুর মধ্যেই তিনি পরিব্যাপ্তা। তাই তাঁর স্তুতির মধ্যে তাঁকে দেখা যায় ক্ষমারূপে, নিদ্রারূপে, ক্ষুধারূপে, তৃষ্ণারূপে, শক্তিরূপে, লজ্জারূপে, শান্তিরূপে, শ্রদ্ধারূপে, ইত্যাদি। আর তাঁকে প্রণাম জানানো হয় "নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ" ব'লে।

পরমা প্রকৃতি তিনি। তাই, তিনি সব কিছু হ'য়ে আছেন। প্রকৃষ্টভাবে যা' করা হ'য়ে আছে তাই প্রকৃতি। যা' কিছু সৃষ্ট বিষয় বা পদার্থ সবই তিনি। তাঁর প্রকাশ বিভিন্ন গুণরূপে, জাতিরূপে, চেতন-অচেতন সব কিছুতে। এমন কিছুই নেই যার মধ্যে তিনি নেই। মায়ের পূজা মানে দুনিয়ার সব কিছুর সাথে একটা সার্থক সঙ্গতি সৃষ্টি করা। যেমন, মায়ের স্নানের জন্য যে জল লাগে, তার মধ্যে সব জায়গারই জল আছে—যথা, উষ্ণোদক, বাপীজল, শিশিরোদক, সর্ব্বৌষধিজল, সমুদ্রজল, গঙ্গাজল, রত্নোদক, সুগন্ধিজল, শঙ্খজল, ইত্যাদি। তা' ছাড়া পঞ্চগব্য ও পঞ্চামৃতও লাগে। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে মায়ের সেবায় কোন কিছুই বাদ নেই। প্রকৃতিতে যা' কিছু আছে সবেরই

প্রয়োজন আছে এই মহাপূজায়। দুর্গাপূজার বিশেষত্বই এইখানে।

এই পূজা হয় শরৎকালে। শরৎকালের পরই হেমন্তকাল, শস্যের উদ্ভবকাল। তারই আগমনী যেন ঘোষিত হয় এই শারদীয়া পূজায়। তাই, নবপত্রিকার মধ্যে নয়টি শস্যের সন্ধান পাওয়া যায়— কলা, কচু, হলুদ, জয়ন্তী, বেল, ডালিম, অশোক, মানকচু ও ধান। লক্ষণীয় যে সবগুলিই জীবনীয় শস্য। শরীরের সুস্থতাবিধানে এদের প্রয়োজনীয়তা অসীম। তাই মায়ের মূর্তির পাশেই নবপত্রিকার স্থান।

মা-দুর্গা অনেক নামে পরিচিতা। তাঁর এক এক গুণবৈশিষ্ট্যে এক এক নাম হয়েছে, যেমন নারায়ণী, ভদ্রকালী, হৈমবতী, ঈশ্বরী, বৈষ্ণবী, মাহেশ্বরী প্রভৃতি। তাঁর বীজমন্ত্র হ্রীং। হ্রী মানে লজ্জা। চলতি কথায় আছে, লজ্জা নারীর ভূষণ। সেইজন্য, বীজমন্ত্র হয়েছে হ্রীং। স্ত্রী-দেবতাদের প্রায় সকলেরই হ্রীং, শ্রীং জাতীয় বীজমন্ত্র দেখতে পাওয়া যায়। কারণ হ্রী (লজ্জা) শ্রী (সৌন্দর্য্য), ইত্যাদি গুণগুলি নারী-চরিত্রের অলঙ্কারস্বরূপ।

তিনি ভগবতী দুর্গা। ভগ মানে ঐশ্বর্য্য। তাই, ভগবতী মানে ঐশ্বর্য্যশালিনী। ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য, এই ছয়টি ঐশ্বর্য্যের নাম 'ভগ'। এই ছয়টিই মা-দুর্গার মধ্যে পূর্ণ মহিমায় বিরাজিত। এমনতর শক্তির অধিকারিণী যিনি তিনিই পারেন মহাযোগী মহাদেবকে স্বামীরূপে বরণ করতে! মহাদেব-ঘরণী তিনি। তাই, মা-দুর্গার চালচিত্রে মায়ের মাথার উপরে আমরা মহাদেবের ছবি দেখতে পাই। স্বামী-গৌরবে তিনি গৌরবান্বিতা। যত কাজই তিনি করুন না, কখনও তিনি স্বামী-ছাড়া নন।

তিনি আবার 'মহামায়া'। মায়া কথাটা এসেছে মা-ধাতু থেকে, অর্থ পরিমাপ করা। মহামায়া মানে মহাপরিমাপনকর্ত্রী। বিশ্বের প্রতিটি বস্তুকে তিনি পরিমাপিত ক'রে সৃষ্টি করেছেন। পাহাড়, নদী, ফুল, পাখী, মানুষ ইত্যাদি যাবতীয় যা' কিছু সবই বিহিতভাবে পরিমাপিত হ'য়ে বিশ্বের মঙ্গলের জন্য যেমনটি থাকা দরকার ঠিক তাই আছে।

কিন্তু এই মায়াশক্তি ঈশ্বরেরই, স্বতন্ত্র কোন শক্তি নয়। এ সেই পরমপিতারই শক্তি। প্রভু বা মূল

কারণ একমাত্র ঈশ্বর। তিনি সর্ববশ্রেষ্টা। তাই, পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ বললেন, এই যে মায়া দেখছ, মায়ার যা' সব খেলা, এ মায়া কিন্তু আমারই (গীতা ৭/১৪)। অর্থাৎ মায়াও তাঁরই সৃষ্টি। ঈশ্বরই স্বীয় মায়াশক্তি দ্বারা জগৎ পরিমাপিত করেন। মায়া আবার প্রকৃতি নামেও আখ্যায়িত হন। প্রকৃতির মধ্যে আছে প্রকৃষ্টরূপে করা। কর্ম্মের এই শক্তিকে আশ্রয় ক'রে জগৎ সৃষ্টি করেন বিশ্বপিতা স্বয়ং। মালিক তিনিই। তাঁরই অধ্যক্ষতায় চরাচর বিশ্ব প্র-কৃ-ত (সম্যকপ্রকারে কৃত বা সৃষ্ট) হ'য়ে আছে। (গীতা, ৯/৮, ১০)।

দেবীপূজার প্রাক্‌কালে বিল্ববৃক্ষে বোধন হয়। এই বোধন ব্যাপারটা কী? বোধন মানে জাগরণ, চেতন ক'রে তোলা। বিশ্বজননীকে পূজা করতে গেলে ইন্দ্রিয়গ্রামকে সদাজাগ্রত রাখতে হয়—যাতে কোনদিকে কোন ত্রুটি না ঘটে, কোন অসৎ-প্রলোভনের কাছে যেন আমরা নতিস্বীকার না ক'রে বসি, বৃত্তির মোহময় আকর্ষণটিকে ঠিকমত ধ'রে ফেলতে যেন দেরী না হয়। তা' ছাড়া, কোথায় কার সাথে কেমন ব্যবহার করতে হবে সে সম্বন্ধেও যেন আমাদের

বোধ চিরচেতন থাকে। বোধের এই জাগরণ ঘটাবার উদ্দেশ্যেই হয় বোধনক্রিয়ার অনুষ্ঠান। এই বিবেক জাগ্রত না হ'লে বিশ্বমাতার সন্তান হ'য়ে ওঠার যোগ্যতা লাভ করা যায় না। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন, "বোধন মানে বোধসূত্র, যা'কে আশ্রয় ক'রে অন্তর-বাহিরের যা' কিছুকে বুঝেসুঝে চলতে পারা যায়।" আবার বললেন—

"মহাশক্তির সন্তান—
আমরা যেন প্রত্যেকেই
বোধবিনায়িত মহাশক্তির অধিকারী
হ'য়ে উঠি,
জীবন তৃপ্তিতে ভ'রে উঠুক,
দীপ্তিতে ভ'রে উঠুক,……
বেদ, জ্ঞান, বিজ্ঞান
জ্বলন্ত হ'য়ে উঠুক সবার অন্তরে।"

সেইজন্য পূজার আগেই হয় বোধনের অনুষ্ঠান। বোধনের ভিতর দিয়ে সূচিত হয় মায়ের আগমন। এক ভাবগম্ভীর দিব্য ঝঙ্কারে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—

"মা আসবে—
এই চিন্তা,

এই মনন-তৎপরতা
মানুষকে দীপ্ত ক'রে
অনর্গল কৃতিদীপনায়
সন্দীপ্ত ক'রে তুলেছে,
বোধনের
বোধপ্রবণ-তৎপরতায়
প্রত্যেকেই অপেক্ষা করছে—
মা ! এস।"

বোধন হয় বেলগাছে। বেলগাছের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছিলেন, শিষ্ট বোধ যাতে উদ্‌বেল (উচ্ছল) হ'য়ে উঠতে পারে সেই-জন্যই বেলগাছে বোধনের অনুষ্ঠান হ'য়ে থাকে। একবারের আশীর্ব্বাণীর মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—

"মার আবাহনের প্রথম আসন হচ্ছে—
বোধনবেদী,
যাতে বিশ্ববিভা
বেলায়িত উচ্ছ্বাসে উচ্ছল হ'য়ে
মায়ের বোধনে
বোধনের বোধনদীপালী নিয়ে
নিঃশব্দ প্রতীক্ষায় অপেক্ষা ক'রে থাকে।"

পূজা মানেই তো সংবর্দ্ধনা, অর্থাৎ যাঁর পূজা করি তাঁর মহনীয় গুণাবলীকে সুনিষ্ঠ অনুশীলনের দ্বারা নিজের চরিত্রগত ক'রে তোলা এবং ধীরে ধীরে তা' বাড়িয়ে তোলা। এর জন্য কোন্‌টা গ্রহণ করতে হবে, কোন্‌টা বর্জ্জন করতে হবে, কোন্ কাজটা কখন কিভাবে করতে হবে, এসব বিষয়ে তীক্ষ্ণ বোধ থাকা দরকার। সেইজন্যই তো মহামায়ার পূজার আগেই বোধনক্রিয়ার অনুষ্ঠান।

অনেক জায়গায় দুর্গাপূজায় বলিদান করা হয়। সোজা বাংলায়, মায়ের সামনে হাঁড়িকাঠে ফেলে ছাগল বা মোষের গলা কেটে ফেলা হয়। এ কেমন পূজা? যাঁকে কল্যাণী, বিশ্বজননী ব'লে অভিহিত করছি, তিনি কি ঐ ছাগল বা মোষের জননী নন? তিনি তো একটা পিঁপড়েরও জননী। সবারই মা। মায়ের সামনে সন্তানকে হত্যা করলে তিনি কি প্রীত হন? বিবেক কী বলে?

আমাদের নিজেদের হিংস্রতা ও লালসাকে পোষণ করতে যেয়ে এরকম নিষ্ঠুরভাবে পশুহত্যা আমরা ক্রমাগত ক'রে চলেছি। তা'তে পূজার উদ্দেশ্য কতখানি সিদ্ধ হচ্ছে? মনটা কতটা ভগবৎ-

মুখী হ'য়ে উঠছে? পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকের উপর দরদী হ'য়ে ওঠায় এই ক্রিয়া কতটা সহায়তা করছে? ইন্দ্রিয়গুলি আমাদের কতখানি তীক্ষ্ণ ও তরতরে হ'য়ে উঠছে? কোনটিই হ'চ্ছে না। কারণ, আমরা বলি-শব্দের প্রকৃত অর্থ জানি না। তাই, বলিদানও হয় না।

বলি হ'ল উৎসর্গ। মায়ের চরণে কামনা-বাসনা, ক্রোধ-লালসা প্রভৃতি বৃত্তিগুলিকে উৎসর্গ করতে হয়। ঐগুলি দিয়ে যাতে মায়ের সেবা হয় তাই করতে হয়। তা' না ক'রে আমরা একটি পাঠা কেটে বিজ্ঞের মত বলি, পাঠা হ'ল কামুক জীব; তাই পাঠা বলি দেওয়ার অর্থ কামরিপুকেই হত্যা করা। তা' ছাড়া, এর পশ্চাতে মাংসাশীদের পাঠার মাংস খাওয়ার লোভটাও থাকে। আবার বলা হয়, মহিষ খুব ক্রোধী, যমের বাহন; তাই মহিষবলি দেওয়া মানে ক্রোধকে বলি দেওয়া। চমৎকার যুক্তি! আমার কাম-ক্রোধ যেমন ছিল তাইই রেখে দিলাম। মাঝে প'ড়ে একটি বা কয়েকটি নিরপরাধ প্রাণী আমাদের অজ্ঞতার শিকার হ'য়ে নিহত হ'ল। বলির একেবারে পরাকাষ্ঠা!

এভাবে জীবহত্যা ক'রে কখনও কামক্রোধ সংযত বা নিয়ন্ত্রিত হয় না। বরং তাতে অন্তরে হিংসা, নিষ্ঠুরতা ও লোভরিপুই বৃদ্ধি পায়।"

পরমদয়াল শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র অভিধান খুলে আমাদের দেখিয়ে দিলেন, বলি-শব্দ এসেছে বল্‌-ধাতু থেকে, মানে বর্দ্ধন। তাই তিনি বললেন, মায়ের পূজায় যে বলি হয় তার মানে বেড়ে ওঠা, বা বলীয়ান করে তোলা, মায়ের পূজা ক'রে মানুষ সংবর্ধিত হ'য়ে ওঠে। তা' ছাড়া আরো কথা আছে। বিশ্বমাতা যেমন চান সেইভাবে রিপুগুলি যদি তাঁর সেবায় নিয়োজিত হয় তখন অসৎ-প্রণোদনা আর মাথা চাড়া দেবার সুযোগ পায় না। মনটা স্বাভাবিকভাবেই শ্রেয়পথে বেড়ে চলতে থাকে। তখন সেই পূজক বা সেবক যা' ভাবে, যা' করে, যা' বলে, সবই হ'য়ে ওঠে মঙ্গল-পথানুবর্তী। তা'র দ্বারা আর অমঙ্গল হ'তে পারে না। এমনতর হওয়াকেই প্রকৃত বলিদান বলা যায়।

দুর্গাপূজার চতুর্থ দিবসে দশমীতে দুর্গাপ্রতিমার বিসর্জ্জন হয়। তারপর বিজয়া-উৎসব পালিত হয়। গুরুজনদের প্রণাম করা হয়, ছোটদের জন্য কল্যাণ

কামনা করা হয়, সমবয়সীদের আলিঙ্গন ও প্রীতি-সম্ভাষণ জ্ঞাপন করা হয়। এই বিসর্জ্জনের তাৎপর্য্য কী? মাকে কি জলে ডুবিয়ে দেওয়ার নাম বিসর্জ্জন?

না। বিসর্জ্জন-শব্দটি ভেঙ্গে দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র বললেন, শব্দটি বি-সৃজ্ ধাতু থেকে উৎপন্ন, বিশেষ প্রকারে সৃষ্টি করা। যে মাতৃপূজা আমরা করলাম, সেই মায়ের সর্বমঙ্গলকারিণী স্নেহ-সুন্দর ভাব ও চরিত্রকে নিজের অন্তরে বিশেষ-ভাবে সৃষ্ট অর্থাৎ দৃঢ়নিবদ্ধ ক'রে তোলা চাই। আমরা যেন ঐ দিব্যভাবে ভাবিত হ'য়ে উঠি, মায়ের সেবায় আমাদের বৃত্তিগুলিকে নিয়োজিত করি, তখনই হয় বিসর্জ্জনের সার্থকতা। এ না ক'রে পূজিত প্রতিমাকে হৈ হৈ ক'রে জলে ডুবিয়ে দিলেই বিসর্জ্জন হয় না। আর, পূজিত ঐ প্রতিমাকে ঘরে সাবধানে রাখার বাস্তব অসুবিধা আছে। আবার, যে শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে ঐ প্রতিমার পূজা করা হয়েছে, পূজার দিনগুলি পার হ'য়ে যাওয়ার পরে সেই প্রতিমাকে যদি ততখানি সম্মানার্হ আদরে রাখতে পারা না যায়, তাতে অন্তরের শ্রদ্ধা ক্ষুণ্ণ হয়

এবং সেটা আমাদের পক্ষে ভাল হয় না। এই সব কারণে প্রতিমাকে নদীতে বা বড় দীঘিতে নিরঞ্জন দেবার ব্যবস্থা করা হয়।

দেবতার দিব্যভাব অন্তরে বিসৃষ্ট (প্রতিষ্ঠিত) করার ভিতর দিয়ে মানুষ দিব্যচেতনাসম্পন্ন হ'য়ে ওঠে। অসৎকে পরাভূত ও নিরস্ত করার শক্তি তার জাগ্রত হয়। পশুশক্তি, অকল্যাণ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে তার বিজয় স্থাপিত হয়। এই হ'ল আনন্দমুখর বিজয়া-উৎসব। তখন সে সবার প্রতি দরদী এবং একটা প্রেমিক মানুষ হ'য়ে ওঠে। সবাইকে সে ভালবাসতে পারে। বড়র প্রতি শ্রদ্ধা, ছোটর প্রতি স্নেহ তার জীবনে সহজ ও স্বাভাবিক হ'য়ে ওঠে। সবাই এমনভাবে চলার ফলে পারস্পরিকতা-বোধও বৃদ্ধি পায়। এরই বাহ্যিক প্রকাশ হ'ল পরস্পর আলিঙ্গন ও প্রীতি-সম্ভাষণাদি।

এই ভাব শ্রীশ্রীঠাকুর কত সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত বাণীর মাধ্যমে। তার কিছু অংশ উদ্ধৃত ক'রে বর্তমান নিবন্ধের উপসংহার করি।

"মনে ক'রো না
মাকে বিজয়া-দশমীতে বিসর্জ্জন দিয়েছ,

বরং ভাব, ঐ দশভুজা, দশপ্রহরণ-ধারিণী
অসুরদলনী সেই মা তোমার
তোমাতেই উৎসৃজিত হ'য়ে
জীয়ন্ত দীপ্তিতে
তোমার জীবনে জীবন্ত হ'য়ে উঠেছেন ;
তাই সেই শুক্লা দশমী
বিজয়া আমাদের সবারই অস্তিত্বের কাছে।"
(সন ১৩৫৮)

"বিজয়া মায়ের বিলয় নয়কো, বিসর্জ্জন,
বিসর্জ্জন মানেই হ'চ্ছে
বিশেষ বিসৃষ্টি।" (সন ১৩৬৫)

"মা
প্রতিপ্রত্যেকের ভিতর
সৎসন্দীপনা নিয়ে
অসৎনিরোধী তাৎপর্য্যে
মূর্ত্ত হ'য়ে থাকুন,
তাঁর আশীর্ব্বাদে
আমাদের প্রতিটি মুহূর্ত্ত
বিজয়া-উৎসবে
বৈজয়ন্তী বিকাশ-বিভবে
বিভবান্বিত হ'য়ে উঠুক ;

নিষ্ঠা—

মাতৃনিষ্ঠা, আনুগত্য

কৃতিসম্বেগের সহিত

শ্রমপ্রিয় তৎপরতায়

মা'র প্রতিটি বৈশিষ্ট্যকে

বিধায়িত ক'রে

বিশাসিত সঙ্গতিতে

সম্বুদ্ধ হ'য়ে ওঠে ;

প্রতিপ্রত্যেকের মুখে

হাসি ফুটুক,

সন্দীপ্তি ফুটুক,

উর্জ্জনা ফুটুক,

আর সব নিয়ে

সঙ্গতিতে সুসংবদ্ধ হ'য়ে উঠুক ;

এমনি ক'রেই মা'র আরাধনা কর,

তা' নিত্য-নিত্যই ক'রো,

ক'রে নিজে সার্থক হও,

প্রতিপ্রত্যেককে সার্থক ক'রে তোল ;"

(সন ১৩৬৭)

লক্ষ্মী

মহামায়া দুর্গাদেবীর দক্ষিণ পার্শ্বে লক্ষ্মীদেবীর অধিষ্ঠান। মা-দুর্গার দুই খ্যাতনামা কন্যা লক্ষ্মী এবং সরস্বতী। কথায় বলে, রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। মায়ের পূজার সঙ্গে তাঁর এই দুই কন্যারও পূজা হ'য়ে থাকে। তা' ছাড়াও পৃথকভাবে বিশেষ তিথিতে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর পূজা হয়। লক্ষ্মীপূজা সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয় দেবীপক্ষের শেষ পূর্ণিমায়, যার নাম কোজাগরী পূর্ণিমা।

মা লক্ষ্মী ধনধান্য ও সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, বাঙ্গালীর ঘরে-ঘরে মহাধূমধামে তাঁর আরাধনা হ'য়ে থাকে। পূজাশেষে গৃহস্থ তাঁর কাছে অভ্যুদয়, সম্পদ ও শ্রী প্রার্থনা করে। অবশ্য, লক্ষ্মীর আরাধনা যেখানে ঠিকমত হয় সেখানে এগুলি স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবেই জেগে ওঠে। মা-লক্ষ্মীর কৃপালাভের জন্য বাংলার মায়েরা প্রতি বৃহস্পতিবারে নিষ্ঠার সঙ্গে লক্ষ্মীর ব্রত পালন করেন। তখন ঘটে সিন্দূরের ফোঁটা ও ঘটের উপরে আম্রপল্লব দেওয়া হয়, পান-

সুপারি সাজিয়ে দেওয়া হয়, এয়োতিরা একত্রে বসে লক্ষ্মীর পাঁচালী পাঠ ও শ্রবণ করেন, পরে পরস্পরের সিঁথিতে সিন্দূর পরিয়ে দেন।

ব্যক্তিগত বা পারিবারিক জীবনে বিভব, উন্নতি, সৌন্দর্য্য কে না কামনা করে? আর, লক্ষ্মীদেবী এসবের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তাই, লক্ষ্মীপূজা আমাদের জাতীয় জীবনে এক বিশেষ আসন অধিকার ক'রে আছে। নিতান্ত গরীব যে, সে-ও তার সাধ্যমত যাহোক কিছু উপকরণ সংগ্রহ ক'রে লক্ষ্মীপূজা সম্পাদন করে।

কিন্তু এমন যদি কোন বাড়ী দেখা যায়, যেখানে লক্ষ্মীপূজার আয়োজন খুব, বাজী-বাজনার বিরাট ধুম, প্রসাদেরও বেশ ঘটা অথচ সেখানকার মানুষগুলির মন অপরিচ্ছন্ন, তারা সদাচারী নয়, অখাদ্য-কুখাদ্য ভোজন-বিলাসী, নারীরা স্বেচ্ছাচারী ও কলহ-পরায়ণা, পুরুষদের আছে চরিত্রের অধঃপতন বা হীন স্বার্থপরতা, সেখানে কি লক্ষ্মী অধিষ্ঠিত থাকেন? ঐখানেই লক্ষ্মী চঞ্চলা হ'য়ে ওঠেন। চঞ্চলা মানে তিনি এক জায়গায় স্থির থাকেন না। হ্যাঁ, থাকেন না সেখানে, যারা তাঁকে রাখতে পারে না। কারণ,

লক্ষীপূজা মানে শুধু কতকগুলি মন্ত্রপাঠ বা পাঁচালী-পড়া, শঙ্খধ্বনি করা, বা পান-সুপারী ও ঘট-পল্লব-সিন্দূর সাজানো নয়। এগুলি পূজার অনুষ্ঠান বা আঙ্গিক। কিন্তু এইগুলিই পূজা নয়। লক্ষীপূজা মানেই লক্ষীদেবী যেমনভাবে চলতে আদেশ করেন সেইভাবে চলা, তিনি যা' পছন্দ করেন তাই করা, তাঁর দৈবী ভাবকে বিহিত অনুশীলন ও অভ্যাসের ভিতর দিয়ে চরিত্রে ফুটিয়ে তোলা, এক কথায়, লক্ষীদেবী হ'য়ে ওঠা।

যে সমস্ত দেবদেবীর পূজা আমাদের দেশে চলিত আছে, সে-পূজাগুলির অনুষ্ঠান হয় বৎসরের বিশেষ বিশেষ সময়ে। পূজাকালে পাথর বা মাটির মূর্ত্তিকেই দেবতা ভেবে, তাঁর সামনে ধূপ-দীপ-নৈবেদ্য দিয়ে পুঁথিতে লিখিত মন্ত্রাদি পাঠ করা হয়। পূজা সাঙ্গ হয়। তারপর দেবতার সঙ্গেও সম্বন্ধ চুকে যায়। নিজেদের সংসারে বা কর্মস্থলে ফিরে যেয়ে যে যার মত চলি। অবশ্য নিত্যপূজার ব্যবস্থা যেখানে, সেখানকার কথা আলাদা। কিন্তু সেখানেও ঐ পূজার সময়টুকুতেই যা' কিছু তৎপরতা। তাও অনেক বাড়ীতেই দেখা যায়, সেটা একটা দায়সারা

কর্ত্তব্যের মত হয়। দেবতার সঙ্গে প্রাণের যোগ কতটুকু স্থাপিত হয়? তাঁর ইচ্ছা-অনিচ্ছা আমরা কতটুকু বুঝে চ'লে থাকি? তা' চলি না ব'লে যে-পূজার যে-ফল হওয়া উচিত তা' আর আমাদের জীবনে পাওয়া হ'য়ে ওঠে না। সেইজন্য আজকাল পূজার হৈ-হুল্লোড় একটা সাময়িক মাদকতায় এসে পর্য্যবসিত হয়েছে।

পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র কোন দেবতাকেই আমাদের কাছে শুধু মন্দিরের প্রতিমা মাত্র ক'রে রাখতে দেন নি। দেবতার ভাবমূর্ত্তিকে তিনি আমাদের জীবনে জীবন্ত ক'রে তোলার কথাই বলেছেন। তাঁর কাছে দেবতা অপরিচিত দূরের কোন সত্তা নন। তিনি ঘরের মানুষ। দেবতার ইচ্ছা আছে, অনিচ্ছা আছে, পছন্দ-অপছন্দ আছে। তাঁকে পূজা করা মানেই তাঁর ইচ্ছা বুঝে ও জেনে সেইমত চলা, যার ফলে তিনি তৃপ্ত ও প্রীত হন। লক্ষ্মীপূজা মানেও লক্ষ্মী যাতে প্রীত হন সেইভাবে চলা।

মা-লক্ষ্মী যেমন ধনধান্যের অধিষ্ঠাত্রী, তেমনি সৌন্দর্য্যেরও দেবী। জগতে যা' কিছু সুন্দর, শোভার

আধার, পবিত্রতার প্রতীক, সেখানেই লক্ষ্মীর বসবাস। ঈশ্বর সত্য, শিব ও সুন্দর। অতএব, সৌন্দর্য্য ঈশ্বরের একটি গুণ, আর লক্ষ্মী সেই সৌন্দর্য্যের দেবী। যাদের বাক্য সুন্দর, ব্যবহার সুন্দর, পরিচ্ছদ সুন্দর, চরিত্র সুন্দর, খাওয়াখানা, ঘরসংসার, কাজকর্ম্ম, খেলাধূলা, লেখাপড়া, সবই সুন্দর ও নয়নানন্দকর, সেখানেই লক্ষ্মী অচলা হ'য়ে অবস্থান করেন। সুন্দর তাকেই বলে যা' আমাদের চোখকে, কানকে বা মনকে পীড়া দেয় না, বরং স্নিগ্ধ করে, জুড়িয়ে দেয়। সুন্দর তাই, যা' দেখেশুনে মনটা বিমল আনন্দে ভ'রে ওঠে এবং নীচতা, সঙ্কীর্ণতা ও অপরিচ্ছন্নতা থেকে মুক্তি লাভ করে। তাই, লক্ষ্মীর আর এক নাম শ্রী বা সৌন্দর্য্য। লক্ষ্মী যেখানে বিরাজিতা থাকেন না তাই-ই হ'য়ে পড়ে হতশ্রী, যার চলতি নাম লক্ষ্মীছাড়া।

এই হতশ্রী বা লক্ষ্মীছাড়া অবস্থা মানুষের কিভাবে আসে তার সুন্দর বর্ণনা আছে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর ব্রতকথার মধ্যে। সেখানে আছে—

"দিবানিদ্রা অনাচার ক্রোধ অহঙ্কার
আলস্য কলহ মিথ্যা ঘিরিছে সংসার॥

উচ্চ হাসি উচ্চ ভাষা কহে নারীগণে।
সন্ধ্যাকালে নিদ্রা যায় ঝগড়া জনে জনে॥
দয়ামায়া লজ্জা আদি দিয়া বিসর্জ্জন।
যেথায় সেথায় করে স্বেচ্ছায় গমন॥......
শ্বশুর শাশুড়ীগণে নহে ভক্তিমতী।
বাক্যবাণ বর্ষে সদা তাহাদের প্রতি॥
পতিরে করিছে হেলা না শুনেব চন।
ছাড়িয়াছে গৃহস্থালী ছেড়েছে রন্ধন॥
পুরুষেরা পরিহাসে সময় কাটায়।
মিথ্যা ছাড়া সত্য কথা কভু নাহি কয়॥

এমনতর অবস্থা যেখানে সেখানেই তো লক্ষ্মী চপলা বা চঞ্চলা। এমনতর মানুষেরা যদি লক্ষ্মীদেবীর পূজা করে, সে পূজা বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ প্রাণহীন অনুষ্ঠানমাত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। লক্ষ্মী সেখানে কিছুতেই থাকতে পারেন না। তাঁর থাকার মত যে অনুকূল পরিবেশটি দরকার, সেখানে তার অভাব ঘটে গেছে।

যদিও পুরুষ-নারী সকলেই লক্ষ্মীপূজা করেন, তবুও যেহেতু লক্ষ্মী স্ত্রী-দেবতা, সেইজন্য লক্ষ্মীপূজায় মায়েদের তৎপরতাই বেশী দেখা যায়। লক্ষ্মীর আড়ি তাঁরা পাতেন, বৃহস্পতিবারে যদি পূর্ণিমা

দেখা দেয় তাহ'লে সেদিন তাঁরাই উপবাস ক'রে লক্ষ্মীব্রত পালন করেন, পূজাশেষে তাঁরাই এয়োতির চিহ্নস্বরূপ পরস্পরকে সিন্দূর দেন। আবার, মা-লক্ষ্মীর তরফ থেকেও দেখা যায়, নারীজাতির জন্যই যেন তাঁর মাথাব্যথা বেশী। স্কন্দপুরাণে লক্ষ্মীর উক্তি—"যেসকল স্ত্রী গুণভক্তিযুক্তা, পতির আজ্ঞানুবর্ত্তিনী, সদা সন্তুষ্টা, ধীরা, প্রিয়বাদিনী, সৌভাগ্যযুক্তা, লাবণ্যময়ী, প্রিয়দর্শনা, সুশীলা, এইসকল গুণযুক্তা স্ত্রীতে আমি সর্ব্বদা অবস্থান করি।" আগেকার দিনে গ্রামে-গঞ্জে পীরের গান শোনা যেত। সে-গানে ছিল চলার পথের ছোট-বড় অনেক রকম সঙ্কেত। ঐ গানেরই একটি অংশ—

"সকালবেলায় ছড়া ঝাঁট সন্ধ্যাবেলায় বাতি।
লক্ষ্মী বলেন সেইখানেতে আমারই বসতি॥"

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে একদিনের কথা। একটি মা সংসারের কাজকর্ম্ম সেরে এসে দাঁড়িয়েছেন শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সামনে। উদ্দেশ্য তাঁর, একটু ঠাকুর দর্শন করে আবার কাজে যাবেন। কিন্তু তাঁর পরণের শাড়ীটা ছিল ময়লা, মাথার চুল ভাল ক'রে আঁচড়ানো নয়। সমস্ত বেশভূষাটাই

একটু অবিন্যস্ত রকমের। মৃদু ভর্ৎসনায় ঐ মাকে সচেতন করে দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—"তোরা সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবি, সদাচারে চলবি, তবেই না সংসারে লক্ষ্মীশ্রী আসবে। তোদের অনেককে দেখি চুলটা ভাল করে আঁচড়াস্ না, সিঁথিতে সিন্দূরটা রীতিমত দিস্ না, কপালে সিন্দূরের টিপটা ভাল ক'রে পরিস্ না, অগোছাল চলনায় চলিস্। তোদের দেখে ছেলেমেয়েদের অভ্যাস অমনি হয়। এটা ভাল না। সব কাজের মধ্যে চাই সৌন্দর্য্য ও শৃঙ্খলাবোধ।"

তাহ'লে দেখা যাচ্ছে, শরীরে, মনে, বাক্যে, আচারে, ব্যবহারে, গৃহস্থালীতে, সাজসজ্জায়, সেখানে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা সেইখানেই লক্ষ্মী অচলা।

লক্ষ্মীর বীজমন্ত্র শ্রীং, অর্থাৎ তিনি শ্রী-স্বরূপিণী। তাই, যে মানুষে বা যে সংসারে অনাচার, কদাচার, ব্যভিচার দাপটে রাজত্ব করে, সেখান থেকে অচিরেই শ্রী অন্তর্হিত হয়। যেখানে হীন স্বার্থপরতা, অর্থলোভ, ঝগড়াঝাটি, খিটিমিটি-করা মেজাজ, অপরকে সহ্য করতে না পারা, হিংসা, স্বেচ্ছাচারী চলন, গুরুজনকে অশ্রদ্ধা করা, অহংমত্ততা, অপরকে

দাবিয়ে রাখার বুদ্ধি, অভিমান বা ঠুনকো মানের আধিপত্য, শ্রী সেখানে থাকে না। ঐসব যাদের অন্তর-সম্পদ, তাদের মন হ'য়ে পড়ে কুৎসিত। মনের সেই ছবি তাদের বাইরের চেহারা ও আচরণেও ফুটে বেরোতে থাকে। শান্ত সৎ স্বভাবের লোক এদের কাছে গেলেই বিরক্তি ও অস্বস্তি বোধ করে। ঐরকম যারা তারা মানুষের সহানুভূতি ও ভালবাসাও হারাতে থাকে। কথায় বলে, 'মানুষই লক্ষ্মীর বরযাত্রী'। মানুষ-সম্বল যার যত বেশী, সে তত বড় ঐশ্বর্য্যশালী। মানুষের জীবন-পথ যিনি তিনিই নারায়ণ। তাই, মানুষের সেবাতেই নারায়ণের সেবা হয়। সেই নারায়ণকে যেখানে অগ্রাহ্য করা হয়, সতী-স্ত্রী লক্ষ্মী কি সেখানে থাকতে পারেন ? আর, লক্ষ্মী যেখানে নাই, সেখানে তাঁর শ্রীও নাই।

সেইজন্য দয়াল ঠাকুর শ্রীঅনুকূলচন্দ্র বলেন, মায়েদের লক্ষ্মীপূজা করা মানে ব্যক্তিগতভাবে তারা এক একটি লক্ষ্মী হ'য়ে উঠুক। শুধু মুখে মুখে "লক্ষ্মীত্বং সর্ব্বভূতানাং" ব'লে মন্ত্রপাঠ করলেই হবে না। মন্ত্রের অর্থগুলি অনুশীলনের ভিতর দিয়ে চরিত্রে

মূর্ত্ত ক'রে তোলা চাই। তাই, লক্ষী-শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করার সময় তিনি শব্দটির ধাতুগত অর্থের উপর দাঁড়িয়েছেন। লক্ষী এসেছে লক্ষ্-ধাতু থেকে, অর্থ—অঙ্কন, চিহ্নীকরণ, জ্ঞান, দর্শন, আলোচনা। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে ধাত্বর্থ অঙ্কন মানে কী জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেছেন, 'মনে এঁকে রাখা'; আর চিহ্নীকরণ মানে বলেছিলেন, 'চিনে (জেনে) রাখা'। লক্ষীর গুণের মধ্যে এই মনে রাখা বা বিষয় ও ব্যাপারগুলি জেনে বুঝে ঠিক রাখার প্রকৃতি আছেই। তাহ'লে ধাতুগত সমস্ত অর্থ নিয়ে ভাবলে লক্ষী মানে বলা যায়— যিনি দেখেন, আলোচনা করেন, গুণাগুণ বিচার ক'রে যেখানে যেটি যেমনভাবে প্রযোজ্য তাকে সম্যকভাবে চিহ্নিত ক'রে রাখেন।

গুণবতী সেবাতৎপর মেয়েকে অনেকে লক্ষ্মী মেয়ে ব'লে আদর করেন, প্রশংসা করেন। এমনিতে মেয়েদের গুণের কথা অনেক জানা থাকলেও প্রকৃত লক্ষী মেয়ে বলতে কী বোঝায় সে সম্পর্কে আমাদের ধারণা খুব পরিষ্কার নয়। এক একজন হয়তো এক এক ধরণের মত পোষণ করি। একদিন এই বিষয় নিয়ে কথা চলছিল দয়াময় শ্রীশ্রী-

ঠাকুরের কাছে। লক্ষ্মী-শব্দের ধাতুগত অর্থকে ভিত্তি ক'রে তিনি ছন্দোবদ্ধ ভাষায় ব্যক্ত ক'রে দিলেন প্রকৃত লক্ষ্মী মেয়ের স্বরূপ। তিনি বললেন—

"সব যা'-কিছু মনে আঁকা
চিহ্ন দেখে চেনে,
জ্ঞান-বোধনার ব্যবস্থিতি
গেঁথে রাখে প্রাণে,
শ্রেয়নিষ্ঠ এমন মেয়েই
লক্ষ্মী মেয়ে হয়,
এমন মেয়ে থাকলে ঘরে
নাইকো কোনো ভয়।" (অনুশ্রুতি ৩য়)

এমনতর হ'য়ে ওঠাই লক্ষ্মীত্ব-লাভ। এ যার হয়, লক্ষ্মীপূজা তারই ঠিক ঠিক করা হয়। প্রকৃত গৃহলক্ষ্মীকে-যে কত বড় ক'রে দেখেছেন শ্রীশ্রীঠাকুর তার প্রমাণ আর একটি ছড়া—

"ঘরের যিনি গৃহলক্ষ্মী
তাঁরই কিন্তু সব,
সেবাতীর্থ হৃদয় যে তাঁর
নারায়ণই বিভব।"

লক্ষ্মীর মধ্যে আছে জ্ঞান, তাই যেখানে লক্ষ্মীর

আবাস সেখানে অজ্ঞানতা থাকে না ; আছে দর্শন, তাই লক্ষ্মী যেখানে থাকেন, সেখানে অদৃষ্ট তার পরিহাস সৃষ্টি করতে পারে না, কারণ সবটাই থাকে দেখা ও জানার মধ্যে ; লক্ষ্মীর মধ্যে আছে সৌন্দর্য্য, তাই কুৎসিত কিছুই সেখানে ঠাঁই পায় না। এক কথায়, লক্ষ্মীতে আছে আলো, তাই সবরকম অন্ধকার সেখান থেকে বিদূরিত। এই প্রসঙ্গে পরম দয়াল শ্রীশ্রীঠাকুর একদিন বড় সুন্দর ক'রে বলেছিলেন—

"No light, no sight, no knowledge (আলো না থাকলে দর্শনও থাকে না, জ্ঞানও থাকে না)। আমরা তো আলোই চাই, জ্ঞানই চাই। আর জ্ঞানোচ্ছল, ভক্তি-উচ্ছল চলন যেখানে সেখানেই তো লক্ষ্মী অর্থাৎ সমৃদ্ধির আবাস।"

লক্ষ্মীর রূপবর্ণনায় আছে—তিনি অতিশয় সুন্দরী, নারায়ণের বাম ভাগ থেকে উৎপন্না, গৌরবর্ণা, দ্বিভুজা, স্থিরযৌবনা। তিনি নারায়ণের সঙ্গে বৈকুণ্ঠে অবস্থান করেন। এই বৈকুণ্ঠ কী ? —বিগত কুণ্ঠা যেখানে অর্থাৎ কুণ্ঠা যেখানে নেই এমনতর যে মানসিক অবস্থা তাই বৈকুণ্ঠ। কুণ্ঠা অর্থে সমস্ত

রকম সঙ্কোচ, সঙ্কীর্ণতা, হীনতা ইত্যাদি। এগুলি যেখানে থাকে না তাই বৈকুণ্ঠ। এগুলির জাল থেকে যে নিজেকে মুক্ত রাখে, ঈশ্বরমুখী তথা ইষ্টমুখী চেতনায় চেতন থেকে সমস্ত কুণ্ঠার অপনোদন ঘটিয়ে ইষ্টপ্রীত্যর্থে জীবন পরিচালিত করে, সে-ই বৈকুণ্ঠ-ধামে স্থিতিলাভ করে।

নারায়ণের সঙ্গে লক্ষ্মী অবিচ্ছেদ্যভাবে অবস্থান করেন। আমাদের পুরাণাদিতে লক্ষ্মী-নারায়ণের কতরকম কাহিনী আছে। লক্ষ্মী নারায়ণের স্ত্রী ব'লে কথিতা। তাই, লক্ষ্মীপূজার সময় নারায়ণপূজা অবশ্য কর্ত্তব্য। নারায়ণকে যে অগ্রাহ্য করে, লক্ষ্মী তার কাছে অবস্থান করেন না, তার পূজাও গ্রহণ করেন না। কেউ যদি নারায়ণকে বাদ দিয়ে লক্ষ্মীর আরাধনা করতে চায়, তার কাছ থেকে লক্ষ্মী চঞ্চলা হ'য়ে স'রে যান।

নারায়ণকে বাদ দেওয়া মানে মানুষের সাথে অসৎ ব্যবহার করা, মানুষকে সইতে-বইতে না পারা, কদাচারী চলনে চলা, শরীরে বা মনে অথবা উভয়তঃই অপরিচ্ছন্ন থাকা, কাম-ক্রোধ-লোভ ইত্যাদির বশীভূত হ'য়ে চলা এবং তার জন্য যা' খুশী তাই

করা, ইত্যাদি। এরকম চলনে চললে নারায়ণ সেখান থেকে অন্তর্দ্ধান করেন। আর নারায়ণ যেখানে নেই সেখানে সতী-স্ত্রী লক্ষ্মী থাকেন না। ঐখানেই লক্ষ্মী চঞ্চলা হ'য়ে ওঠেন।

লৌকিক জগতেও আমরা কী দেখে থাকি? কোন বাড়ীতে যেয়ে কেউ যদি সেই বাড়ীর কর্ত্তার খোঁজখবর না নিয়ে বাড়ীর বধূটির সাথে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করে, প্রকৃত সতী নারী কখনও অমন মানুষকে পাত্তা দেবে না। 'এখন উনি বাড়ী নেই, বাড়ী এলে আসবেন' ব'লে হয়তো মুখের উপর দরজাই বন্ধ করে দেবে।

আবার, সতী নারী যদি দেখে, কোন লোক তার স্বামীকে অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধা করছে, তাঁর কাজের সাহায্য করছে, তাঁর কোন প্রয়োজনে না-ডাকতেই এসে দাঁড়াচ্ছে, তখন সে ঐ লোকটিকে ঘরে এসে বসতে বলে, অতি পরিশ্রমে তাকে কাতর দেখলে তাকে হয়তো জল-টল খেতে দেয়,—এইরকম ব্যবহার করে। ঠিক তেমনি নারায়ণকে যে ভালবাসে, তাকে মা-লক্ষ্মীও দয়া করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র জগতের কাছে লক্ষ্মী-

চরিত্রের এই আদর্শই তুলে ধরেছেন। কোন এক-সময়ে জনৈকা মাকে লিখিত একখানা চিঠির মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর লিখেছিলেন—

"যেখানে নারায়ণ নেই সেখানে কি লক্ষ্মী থাকতে পারে? আর, লক্ষ্মীকে অপমান ক'রে, জোর ক'রে, আটক ক'রে যদি কেউ রাখে, তবে রাবণের মত দশা হয় বোধ হয়। কিন্তু লক্ষ্মীকে কেউ তুষ্ট রাখতে পারলে নারায়ণকে সে পাবে—পাবেই নিশ্চয়। ...যে-কর্ম্ম নারায়ণকে (সৎ থাকা, বৃদ্ধি পাওয়া) বরণ করে না, তাতে শ্রী বা লক্ষ্মী (সেবা করা) অতুষ্ট বা অবমানিত, তা' সর্ব্বনাশ এনে দেয়।"

টাকা-পয়সা যারা উপার্জ্জন করতে চায়, তাদের নারায়ণের সেবা করতেই হয়। আর, নারায়ণের মধ্যে আছে নরের অয়ন—মানুষের জীবনপথ। তাই, নারায়ণপূজা মানে মানুষের সেবা করা, মানুষগুলি যাতে সুস্থ সক্ষম তাজা থাকে তাই ক'রে চলা। কিন্তু টাকা-বাগানোর ফন্দী নিয়ে যারা মানুষের সেবা করে, তারা শেষ পর্য্যন্ত ব্যর্থ হয়। একটি ছড়ায় বলেছেন শ্রীশ্রীঠাকুর—

"টাকার টানে পিরীত হয়,
সে-প্রেম কিন্তু কিছুই নয়।" (অনুশ্রুতি ৭ম)

বিশ্বসত্তার দুই বিপরীত সত্তা—লক্ষ্মী এবং নারায়ণ। নারায়ণ যেন 'পজিটিভ্' শক্তি, আর লক্ষ্মী 'নেগেটিভ্'। তাই কথিত আছে, অনন্তশয্যায় শায়িত নারায়ণ, লক্ষ্মী তাঁর পদসেবা করছেন। পদ হচ্ছে চরণ। নেগেটিভ্ প্রকৃতি 'চর', আর পজিটিভ্ পুরুষ 'স্থির'। দুইয়ের মিলনে সৃষ্টির উদ্ভব। নারায়ণের নাভিপদ্ম থেকে জাত হলেন ব্রহ্মা। তিনি সৃষ্টিকর্তা। ব্রহ্মা মানে যার বৃদ্ধি ও দীপ্তি আছে। সৃষ্টির প্রথম প্রকাশ ঐ ব্রহ্মার মধ্যে। ব্রহ্মা অর্থাৎ বিরাট বিস্তৃতির মাঝেই ধীরে-ধীরে উদ্ভূত হয়ে উঠল নীহারিকা, গ্রহ, নক্ষত্র, পৃথিবী, পাহাড়, গাছ, মানুষ, গরু, ইত্যাদি যা' কিছু সব। এই দিক দিয়ে দেখলে নারায়ণ ও লক্ষ্মীর কথা সমগ্র সৃষ্টি-ধারার আদিতম উৎসেরই কথা।

পুরাণে আছে, দেবাসুরের সমুদ্রমন্থনের ভিতর দিয়ে অন্যান্য অনেক কিছুর সঙ্গে লক্ষ্মীও উঠেছিলেন। তাই, তাঁর অপর নাম 'ক্ষীরাব্ধিতনয়া' বা 'জলধিজা'। এ ব্যাপারটা কী ? এইসবের তাৎপর্য্য ঠিকমত বোধ না করার দরুণ অনেক জিনিস আমাদের কাছে দুর্ব্বোধ্য বা রহস্যাবৃত থেকে যায়।

সমুদ্র মন্থন ক'রে লক্ষ্মীলাভ করতে হয়, তা' হল এই সংসার-সমুদ্র। এ সংসারে বিহিত চেষ্টা ও অনলস পরিশ্রমের ভিতর দিয়েই সৌভাগ্যলাভ হ'য়ে থাকে। এই চেষ্টা ও পরিশ্রমই হচ্ছে মন্থন (আলোড়ন)। আর মন্থনদণ্ড হচ্ছে নিজের দাঁড়া (principle)। উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য নিজের দাঁড়া ঠিক রাখতে হবে। কোন সংশয়, সংকোচ বা জড়তায় টললে-তুললে হবে না। নিজ দাঁড়ায় দাঁড়িয়ে উদ্দেশ্যে স্থির লক্ষ্য রেখে, পুরাণে উক্ত দেবতাদের মত সংগ্রামী, অধ্যবসায়ী, কর্ম্মকুশল-তৎপরতায় এগিয়ে চলতে পারলে মানুষ সৌভাগ্যলক্ষ্মীর দেখা পায়। এই হ'ল সমুদ্রমন্থনের ভিতর দিয়ে লক্ষ্মীলাভের তাৎপর্য্য। আর, যারা শ্রমবিমুখ, তাদের ভাগ্যও পিছিয়ে চলতে থাকে, জীবনের দৌড়ে পরাজিত হয় তারা, বঞ্চিত হয় লক্ষ্মীর কৃপালাভে।

সেইজন্য লক্ষ্মীর আর এক নাম 'ইন্দিরা'। ইন্দিরা এসেছে ইন্দ্‌-ধাতু থেকে, মানে পরমৈশ্বর্য্য। তিনি পরম-ঐশ্বর্য্যবতী, তাই তিনি ইন্দিরা। লক্ষ্মীর আর এক নাম 'কমলা', কারণ তিনি কমভাব বা কান্তির প্রতীক। তিনি আবার 'পদ্মা'। পদ্মও

সৌন্দর্য্য ও কমনীয়তা প্রকট করে। এগুলি সবই লক্ষ্মীর রূপের বিভিন্ন দিক্। তাঁর 'রমা' নামের তাৎপর্য্য হ'ল—অনুগত সন্তানগণের প্রতি তিনি স্নেহ-পরায়ণা, তাদের কল্যাণবিধানে নিয়ত রত বা তৎপর।

লক্ষ্মীর বাহন হ'ল পেচক (প্যাঁচা)। কেন? কারণ, পেচক হ'ল অন্ধকারের জীব। সে রাতেই চ'রে বেড়ায়। সে মাংসাশী এবং হিংস্র। এই পেচক-চরিত্রের মানুষ সংসারে আছে। মা-লক্ষ্মী তাদের বাহন ক'রে রাখেন। তার মানে নিজ কর্ত্তৃত্বাধীনে রেখে তাদিগকে মানুষের মঙ্গলের জন্য কাজ করতে শেখান, সাথে সাথে তাদের স্বভাব সংশোধনেরও চেষ্টা করেন।

অন্ধকারে কারা বিচরণ করে?—যারা আলোয় আসতে ভয় পায়। দুনিয়ার যত পাপ অনুষ্ঠিত হয় অন্ধকারে, লোকচক্ষুর অগোচরে। কালো টাকার লেনদেন যেখানে হয়, নারীর শ্লীলতা নিয়ে যেখানে ছিনিমিনি খেলা হয়, পরকে ফাঁকি দিয়ে নিজের পেট ভরানোর ব্যবস্থা যেখানে প্রধান কর্ম্ম হ'য়ে ওঠে, এ সবই অন্ধকারেরই কর্ম্ম। আলোর মাঝে অর্থাৎ প্রকাশ্যে এসব কাজ হয় না। আবার, দম্ভ, অভিমান,

নিষ্ঠুরতা, কপটতা, আত্মসুখপ্রবণতা ইত্যাদি অবগুণ যাদের প্রবল, তাদের মনের মধ্যেও ঘোর অন্ধকার বাসা বেঁধে আছে।

কিন্তু অন্ধকারের হোক আর আলোকেরই হোক, সমস্ত জীবেরই স্রষ্টা সেই এক পরমপিতা। তিনি চান না—যারা অন্ধকারে আছে তারা চিরকাল অন্ধকারে থেকেই শেষ হ'য়ে যাক, তাদের মনের ময়লা যেন কোনদিন দূর না হয়। বরং তারা আলোকের সংস্পর্শে আসুক, তাদের অন্তরের অন্ধকার দূর হ'ক, পরার্থপরতায় তৎপর হওয়ার ভিতর দিয়ে তাদের হৃদয় প্রসারিত হোক, এই তাঁর চাহিদা। কিন্তু শুধু মনে মনে চাহিদা থাকলেই তো প্রাপ্তি ঘটে না, চাহিদা-আনুপাতিক কর্ম্ম বা প্রয়োগ-পদ্ধতি চাই। আর, নিকৃষ্ট চরিত্রদিগকে উৎকৃষ্ট ক'রে তোলার একটা বিশেষ পদ্ধতি হ'ল তা'দিগকে শ্রেষ্ঠ সুনিষ্ঠ সদাচারী দরদী মানুষের সংসর্গে রাখা, তাঁদের সেবা-অনুচর্য্যা নিয়ে যাতে চলতে পারে তার ব্যবস্থা করা। তার ভিতর দিয়ে আসবে ঐ শ্রেষ্ঠের প্রতি আসক্তি বা টান। তখন তিনি যেমন পছন্দ করেন সেইভাবে চলতে ইচ্ছা করে। এইভাবে যেমন আলো

জ্বললেই অন্ধকারের বিনাশ ঘটে, তেমনি শ্রেয়-অনুরক্তি যত বাড়বে, অশ্রেয়-অনুরক্তি তত ক'মে যাবে আপনা থেকে। এই চমৎকারী পদ্ধতির কথা ভগবান শ্রীকৃষ্ণও বলছেন।

"দুরাচারী যত্নে করি আমার ভজন
ধর্ম্মাত্মা হইয়া শীঘ্র, পায় শান্তি ধন ;
জানিবে হে ধনঞ্জয়, একথা নিশ্চয়,—
'কখনো আমার ভক্ত বিনষ্ট না হয়।'

(গীতা ; কুমারনাথ সুধাকর)

মা-লক্ষ্মী যে পেচকবাহন তার তাৎপর্য্যও এই-খানে।

লক্ষ্মীপূজার অপরিহার্য্য অঙ্গ ধান-দূর্ব্বা। কেন ? কারণ, ধান আমাদের প্রধান খাদ্যশস্য। পূজার উপকরণ-হিসাবে ধান রাখা মানে প্রধান খাদ্যশস্যকে অবহেলা না-করা, ফসলের যত্ন করা। যাকে রাখা যায়, সে-ই রাখে। পূর্ব্ব থেকেই বিহিত প্রস্তুতি নিয়ে, প্রাকৃতিক নানা বিপর্য্যয়কে এড়িয়ে, কৃষিকাজের যথাযোগ্য সুব্যবস্থা করে, ধান্যাদি ভাল উৎপাদনের ও সুরক্ষার ব্যবস্থা যদি করা হয়, তবে প্রয়োজনের সময়ে ধানও আমাদের মুখে খাদ্য জুগিয়ে আমাদের

রক্ষা ক'রে চলবে একথা অতিনিশ্চয়। লক্ষ্মীপূজায় ধান্যের এই বিশিষ্ট স্থান নির্দেশ দ্বারা ফসলের প্রতি যত্ন নেওয়ার ইঙ্গিতই বুঝতে হবে।

আর দূর্ব্বা হ'ল সজীবতা ও মৃত্যুহীনতার প্রতীক। সাধারণতঃ দূর্ব্বাঘাস সহজে মরে না। এর শিকড় যদি কোনভাবে মাটিতে থেকে যায়, সেখান থেকে আবার নতুন দূর্ব্বা গজায়। দূর্ব্বা হাতে নেওয়া মানে অমরত্বের শরণ দিয়ে চলা। তাছাড়া দূর্ব্বা চিরশ্যামল। এই শ্যামলতা হল সজীবতা তথা নবীন-প্রাণতার প্রতীক। দূর্ব্বা হাতে নেওয়ার ভিতর দিয়ে প্রাণবত্তা ও চিরনবীনতাকেই বরণ করা হয়।

এইভাবে তাৎপর্য্যগুলি জেনে ও বুঝে যদি লক্ষ্মীর উপাসনা করা হয়, তখনই লক্ষ্মীপূজা সার্থক হয়। আবার, শুধু জানলে-বুঝলেই হবে না, সেগুলিকে জীবনে বিহিতভাবে প্রয়োগ ও ব্যবহার করা চাই। তা' করতে গেলেই প্রয়োজন তদনুপাতিক চলন। আর, এই চলা ঠিক থাকলেই মানুষ লক্ষ্মীর আশী-র্ব্বাদে ভরপুর হ'য়ে উঠতে পারে।

সরস্বতী

সরস্বতী বিদ্যার দেবতা। সকল বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী তিনি। গায়ত্রী-রহস্যোপনিষদে আছে "সরস্বত্যাঃ সর্ব্বে বেদা অভবন্"—সরস্বতী থেকেই সৃষ্টি হয়েছে সমস্ত বেদ। আরো নানা জায়গায় সরস্বতী সম্বন্ধে নানা উক্তি আছে। বিভিন্ন তাঁর নাম—বাক্, বাক্যেশ্বরী, গির্, ভাষা, ভারতী, বাণী প্রভৃতি। তিনি শুক্লবর্ণা, শ্বেতবসনা, কমলবাসিনী, হংসবিহারিণী। হস্তে তাঁর বীণা, গলায় মুক্তার মালা, ক্রোড়ে পুস্তক। এই রূপে আমরা মা-সরস্বতীকে দেখতে অভ্যস্ত। কিন্তু এই রূপের তাৎপর্য্য কী?

পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের কাছে আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত সব বিষয়েরই আলোচনা হয়েছে। একবার সরস্বতী-পূজার প্রাক্কালে উঠল সরস্বতী-প্রসঙ্গ। জানতে চাওয়া হ'ল দেবীর সম্বন্ধে। প্রথমেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'সরস্বতী মানে কী?' অভিধান দেখা হ'ল। অভিধানে আছে

'সরস্‌ + বতী', সরস্‌ বা সরঃ মানে জল। তাহ'লে যিনি জলবতী, তিনি সরস্বতী। ওভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে বললে হ'ত না। তিনি প্রতিটি অর্থেরই ধাত্বর্থ দেখতে বলতেন। তদনুযায়ী সরস্‌-শব্দের ধাতু দেখা গেল 'সৃ', মানে গতি, চলা। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন, "তাহ'লে সরস্বতী মানে গতিমতী, যিনি গতির প্রতীক।" গতি ছাড়াও সৃ-ধাতুর অপর এক অর্থ 'বিকশিত হওয়া'। তাই 'সরস্বতী' শব্দের মধ্যে বিকাশের আকুলতাও আছে।

সরস্বতীর আর এক নাম বাগ্‌দেবী। বাক্‌ মানে বাক্য বা শব্দ। তা' শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছিলেন, "তাহ'লে সরস্বতী শব্দেরও দেবতা।"

সরস্বতী-প্রতিমার মধ্যে সৃজন-প্রগতিকে লক্ষ্য করা যায়। সরস্বতী গতির প্রতীক। সৃষ্টির আদিতেও আছে ঋত (ঋ ধাতু—গতি)। অনন্তের বুকে আকর্ষণ-বিকর্ষণের গতির মধ্য দিয়ে সৃষ্টির প্রথম সঞ্চার। সেখান থেকেই সৃষ্টি বিকশিত হ'য়ে উঠল। আবার, এই গতির মধ্যে আছে স্পন্দন। স্পন্দনই ব্যক্ত হ'য়ে উঠেছে শব্দে। অনন্ত ব্যোমে এই শব্দ ছড়িয়ে আছে নানা রূপে। তাই, শ্রীমদ্ভাগবতে

আছে, আদিতে পরমব্রহ্ম শব্দরূপী। তাঁকে উপলব্ধি করতে হ'লে শব্দের উপাসনা করতে হয়। সরস্বতী-পূজা সেই শব্দ-উপাসনারই ব্যাপার।

এখন আমরা প্রতিমার আঙ্গিকগুলি বিশ্লেষণ ক'রে সমস্ত চিত্রটা বোঝার চেষ্টা করি। পরম দয়াল শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের কাছে এক একটি বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে। প্রত্যেকটিরই সমাধানী উত্তর দিয়ে মানুষের জ্ঞানের ক্ষুধা তিনি মিটিয়ে দিয়েছেন। তিনি যেভাবে যা' বলেছেন, আমরা সেই দৃষ্টিভঙ্গিকে অনুসরণ ক'রেই মা সরস্বতীকে হৃদয়ঙ্গম করতে চেষ্টা করি।

মায়ের চরণ যে পদ্মের উপরে ন্যস্ত, সেই পদ্মটি ফুটে আছে জলে। এই জল কী? মনুসংহিতায় আছে, অব্যক্ত ঈশ্বর যখন জীবজগৎ সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করলেন তখন তিনি প্রথমে জল সৃষ্টি করলেন (১৮)। জল প্রথম সৃষ্টি কেন? কারণ, জল না হ'লে কোন প্রাণীই বাঁচে না। আবার পঞ্চ মহাভূতের (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম) মধ্যে প্রথম ঘনীভূত অবস্থা ঐ জল (অপ্)। এর আগে আছে ব্যোম অর্থাৎ শূন্য, মরুৎ অর্থাৎ বায়ু, এবং

তেজ অর্থ অগ্নি। সবটাই বায়বীয় বা বাষ্পীয় অবস্থা। ঘনীভূত প্রথম ভূতই হল জল। তাই, জল সৃষ্টির প্রথম পর্য্যায়ের প্রতীক।

জলের উপরে পদ্ম। পদ্ম-শব্দের উৎপত্তি পদ্-ধাতু থেকে, অর্থ গতি, স্থিতি, প্রাপ্তি। সৃষ্টির প্রথম ধাপেই আছে গতি ও স্থিতি—ঋত ও সত্য(ঋগ্‌বেদে)। একে আশ্রয় ক'রেই কোন কিছু বিকশিত বা বিবর্ধিত হয়ে ওঠে। কোন মানুষ যখন হেঁটে যায়, তখন একটি পায়ে স্থিত হ'য়ে তারপর আর একটি পা বাড়ায়। একটি শিশু বটগাছের চারা যখন বিরাট হয়, তখন তা' সেই বটগাছই থাকে, থেকে বেড়ে বেড়ে ওঠে। এই গতি ও স্থিতি সৃষ্টির সবকিছুর মধ্যেই অন্তঃস্যূত। বিশ্বসৃষ্টির প্রথম ধাপেও একটা অবস্থিতিকে অবলম্বন ক'রে সৃষ্টি বিকশিত হ'য়ে উঠেছিল। হ'য়ে থেমে নেই, এগিয়ে চলেছে তা' একটা পরিণতির দিকে—যার আর এক নাম দেওয়া যায় প্রাপ্তির দিকে। গতি যেমন, পরিণতি বা প্রাপ্তিও হয় তেমনি।

মা-সরস্বতী হংসাসীনা। 'হংস' বলতে শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন 'অহং সঃ', অর্থাৎ আমিই সেই, তার মানে

প্রতিটি ব্যক্তি। যিনি সর্ব জ্ঞানের অধীশ্বরী, প্রতিটি মানুষ তাঁকে বহন ক'রে নিয়ে চলুক, এই হ'ল হংসারূঢ়া দেবীর তাৎপর্য্য। বিদ্যা তথা জ্ঞানের চর্চা যে পরিবারে বা যে সমাজে যত বেশি, তাদের মনের তার তত উঁচু গ্রামে বাঁধা থাকে। হীনতা, সঙ্কীর্ণতা, স্বার্থপরতা, অশ্লীলতা সেখানে ঠাঁই পায় না। মানুষের মন উদার হয়, পরার্থপর হয়; তাদের সহন, ধারণ ও বহনশক্তি বাড়ে। এই-জন্যেই দেবী হংসবিহারিণী। তাছাড়া আরও আছে। হংস হ'ল কলনাদী বা কলকণ্ঠ। কল-শব্দের উৎ-পত্তি কল্‌-ধাতু থেকে, মানে গতি, শব্দ। হংস-রূপী প্রতিটি ব্যক্তিসত্তাই শব্দব্রহ্ম থেকে উদ্ভূত, আর সৃষ্টির প্রতিটি পদার্থের মধ্যেই আছে গতি বা চলমানতা। সবই নিরন্তর গতিশীল। তাই, বিশ্বের অপর নাম জগৎ (গম্‌-ধাতু থেকে, অর্থ গতি)। তাই, গতি ও শব্দ হংসের মধ্যে নিত্য অবস্থিত।

মায়ের কোলের উপরে বই। তিনি যে বিদ্যার দেবী। পুস্তক বা গ্রন্থ সেই বিদ্যার প্রতীক। জ্ঞানচর্চা তাঁরই ক্রোড়ে লালিত হয়। আমরা

আগেই বলেছি, সরস্বতীর মধ্যে সৃজন-প্রগতি যেন বিকশিত হ'য়ে উঠেছে। তাঁর মধ্যে নিহিত আছে সৃষ্টির মূল কথাগুলি। সেই মূল কারণ যে অবগত হ'তে পারে, তারই তো প্রকৃত বিদ্যালাভ হয়। বিদ্যা-শব্দের উৎস সংস্কৃত বিদ্-ধাতু। তার অর্থ—জ্ঞান, বিচারণা, অস্তিত্ব, প্রাপ্তি। তাহ'লে বিদ্যা-লাভ যার হয় তার অস্তিত্ব বজায় রাখার জ্ঞান থাকে। বিচারশক্তি থাকে, মন্দ থেকে ভালটাকে সে বেছে বের ক'রে নিতে পারে এবং এইভাবে সে এগিয়ে চলে তার মূল প্রাপ্তি বা গন্তব্যের দিকে। সে গন্তব্য হ'ল ধারণ-পালনী-সম্বেগসিদ্ধ ব্যক্তিত্বলাভ, অপর কথায় ঈশ্বরপ্রাপ্তি। এই সব অবস্থাটাই মায়ের ক্রোড়ে সযত্নে পালিত, পোষিত ও বর্ধিত হয়। পুস্তকের অপর তাৎপর্য্য হ'ল, পুস্তক পাঠ করা হয় এবং পাঠের একটা শব্দ আছে। পুস্তকস্থ পদ ও বাক্যগুলি শব্দ সহযোগেই গঠিত। আর, এই শব্দ তথা জগতের সব শব্দই সেই পরম শব্দব্রহ্মের থেকেই উদ্ভূত।

সরস্বতীর হস্তে বীণা। বীণাতেও উত্থিত হয় ধ্বনি বা নাদ। তাও ঐ শব্দ-উপাসনারই প্রতীক।

সরস্বতীর বীজমন্ত্র ঐং। এই ঐং-ধ্বনি ঝঙ্কার-সহ উচ্চারণ করলে অনেকটা বীণাধ্বনির মতই প্রতীতি হয়। সাধনস্তরে সাধক একটা জায়গায় এই বীণাধ্বনি শুনতে পান। সেই স্তরের নাম সত্য-লোক, অর্থাৎ যেখান থেকে অস্তিত্বের বার্তা প্রচারিত হয় (অস্-ধাতু—অস্তিত্ব, বিদ্যমানতা ; অস্ + শতৃ—সৎ)। শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সাধনার বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে বলতে গিয়ে এখানকার সম্পর্কে বলেছেন—"ওখানে এরকম শব্দ হয়।" উপলব্ধিবান সাধক সেই ধ্বনি অন্তর-কর্ণে শ্রবণ করেন।

ওঁ, ঐং, হ্রীং, ক্লীং প্রভৃতি যেসব বীজমন্ত্র আছে, সেগুলিও নাদের বা শব্দের বিভিন্ন স্তরের কম্পন। শব্দকে যদি অধিগত করা যায়, তবে সৃষ্টিধারার মূল মরকোচ হাতে এসে যায়। তখন বিষয় ও ব্যাপার সমূহের কার্য্যকারণ-সম্বন্ধও চিত্তে ধরা পড়ে। তাই, সদ্‌গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে বিধিমত নামজপ করার নির্দেশ আছে। আর, যে-কোন পূজার আগেই গুরুপূজা অপরিহার্য্য।

সরস্বতীর আর এক নাম ভদ্রকালী, অর্থাৎ তিনি কল্যাণগতিসম্পন্না। তাঁকে ভালবেসে, তাঁর

সেবা ক'রে মানুষ শব্দস্তরকে আয়ত্ত করতে পারে। শব্দের ক্রমাধিগমন এবং বিষয় ও বস্তুতে তা' কিভাবে মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে, সেই বিন্যাসক্রম যার করায়ত্ত, সে শব্দকে ইষ্টার্থে প্রয়োগ ও ব্যবহার ক'রে কল্যাণের অধিকারী হ'য়ে উঠতে পারে।

সরস্বতীর আটটি শক্তি—লক্ষ্মী, মেধা, ধরা, তুষ্টি, গৌরী, পুষ্টি, প্রভা, ধৃতি। সরস্বতীর একনিষ্ঠ সেবক যে তার ভিতর স্বতঃই ঐ সব শক্তির জাগরণ ঘটে।

সরস্বতী শুক্লবর্ণা, শুভ্রবস্ত্রাবৃতা। এই সাদা রঙ-এর তাৎপর্য্য কী? সাদা রঙ পবিত্রতার প্রতীক। আবার, সত্ত্বগুণের রঙও সাদা। সত্ত্বগুণ মানে অস্তিত্ব যাতে বজায় থাকে তার চর্চা (সৎ+ত্ব—সত্ত্ব)। সত্ত্বগুণের চরিত্র হচ্ছে হালকা। তা' সহজে উপরের দিকে উঠতে পারে। উপরের দিকে উঠতে পারে কে? যার নীচের দিকে ওজন ভারী নয়, অপর কথায় প্রবৃত্তির পাষাণ-ভার থেকে যে মুক্ত। প্রবৃত্তিমুক্ত যে সেই তো প্রকৃত মুক্ত। আবার দেখা যায়, সমস্ত বর্ণ একত্র মিশ্রিত করলে সাদা হয়। সরস্বতীর শুভ্র বর্ণের মধ্যে এই মিলন

বা সমাহারের ইঙ্গিত বর্ত্তমান।

এইভাবে সবটা দেখলে বোঝা যায় যে, সরস্বতীর উপাসনা মানে পরব্রহ্মেরই উপাসনা, সৃষ্টিতত্ত্বের উপাসনা। এই তাৎপর্য্য জেনে যাঁরা পূজা করেন, তাঁদেরই সরস্বতী পূজা সার্থক হয়। মা-সরস্বতী সতাৎপর্য্যে তাঁদের নিকট প্রতিভাত হন।

এই কারণে সৎসঙ্গ-আশ্রমে পূজার মধ্যে একমাত্র সরস্বতীপূজাই হয় সাড়ম্বরে। শ্রীশ্রীঠাকুর স্বয়ং পুষ্পাঞ্জলি দিতেন হাঁটু গেড়ে ব'সে এবং পরে প্রণামী-সহ প্রণাম নিবেদনও করতেন। অসুস্থতার জন্য যখন মণ্ডপগৃহে যেতে পারতেন না, তখন ঘরে নিজ শয্যাতে ব'সেই পুষ্পাঞ্জলি দিতেন। পুরোহিত সেখানে এসে মন্ত্র পড়িয়েছেন। পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে ভক্তিভরে মা-সরস্বতীকে প্রণাম না করা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীঠাকুর আহার গ্রহণ করতেন না। তিনি যে লোকগুরু! আচরণ ক'রে শিখিয়ে দিয়েছেন কিভাবে চলতে হয়, মায়ের সামনে কেমন বিনীত ভঙ্গিমায় বসতে হয়, অঞ্জলি দিতে হয়। আবার, তাৎপর্য্য ভেঙ্গে বুঝিয়ে দিয়েছেন মা-সরস্বতী কী; সরস্বতী প্রতিমার সজ্জা এমনতর কেন! সমস্ত তাৎপর্য্য

সংহত ক'রে, সেই ভাব ছোট একটি বাণীতে শ্রীশ্রী-ঠাকুর ব্যক্ত করেছেন। সেই বাণীটি উদ্ধৃত ক'রে এ নিবন্ধের উপসংহার করি—

"বিকাশ-ব্যাকুল গতিই যাঁর সংস্থিতি—
তিনিই সরস্বতী,
আর, বাক্ বা শব্দই যাঁর সত্তা—
তিনিই বাগ্‌দেবী ;
তাই, যিনিই বাগ্‌দেবী
তিনিই সরস্বতী।"

গণেশ

গণেশ অর্থাৎ গণ-ঈশ। 'গণ' সংখ্যাবাচী শব্দ। অনেকে বলে, গণ মানে জনগণ, অর্থাৎ মানুষের সমষ্টি। কিন্তু শুধু মানুষ কেন, গণ বলতে যা' কিছু সব—পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, বৃক্ষলতা, সকল পদার্থ। এই সব কিছুরই যিনি ঈশ (অধিপতি), তিনিই গণেশ।

'ঈশ' শব্দের উৎপত্তি সংস্কৃত ঈশ্-ধাতু থেকে, মানে আধিপত্য। আধিপত্যের মধ্যে আছে অধিপতি। অধিপতির মধ্যে আবার দুটি শব্দ—অধি ও পতি। অধি-র উৎপত্তি ধা-ধাতু থেকে, অর্থ ধারণ এবং পতি-র উৎপত্তি পা-ধাতু থেকে, অর্থ পালন। তাহ'লে অধিপতি মানে যিনি ধারণ-পালন করেন।

এইবার 'গণেশ' শব্দের সমূহার্থ দাঁড়ালো—সৃষ্টির যাবতীয় যা'-সব কিছুকে যিনি ধারণ, পালন ও পোষণ করেন।

এই কারণে, যে কোন দেবপূজায় গণেশের পূজা হয় সর্বাগ্রে। তিনিই তো সবার ধারয়িতা, পোষয়িতা ও পালয়িতা। তাঁকে অর্ঘ্য দিয়ে প্রণাম ক'রে তবে

পূজার সুরু হয়। তাঁর আর এক নাম গণপতি—গণের পালন ও রক্ষণকর্ত্তা। সৃষ্টি বা ধ্বংসের কারক তিনি নন, রক্ষার কারক। তাই, সর্ব্বাগ্রে তাঁর আবাহন।

গণেশের পিতা শিব এবং মাতা দুর্গা। শিব অর্থাৎ যিনি মঙ্গলস্বরূপ। তাঁর থেকেই আবির্ভূত গণপতি। গণকে যিনি পালন ও রক্ষণ করবেন, তিনি অবশ্যই মঙ্গলবিধায়ক। কারণ, মঙ্গল না হ'লেই হবে অমঙ্গল। আর, অমঙ্গল আনবে জীর্ণতা, জরা, বিচ্ছিন্নতা ও বিনাশ। কিন্তু গণেশ তো স্থিতি ও রক্ষারই ধাতা। তাই, তিনি অবশ্যই শিবসম্ভব, মঙ্গল থেকে জাত। জননী তাঁর দুর্গা। দুর্গা মানে জীবনের দুর্গস্বরূপা যিনি, যাঁর কাছে সমস্ত অশুভ শক্তি প্রতিহত, বিপর্য্যস্ত ও বিনিষ্ট হয়। সমস্ত অকল্যাণের বিরুদ্ধে দুর্গা হ'য়ে আছেন যিনি, তিনিই তো মা দুর্গা। গণেশ-জননী তিনি। এমন মা না হ'লে কি আর এমন পুত্র হয়? তাহ'লে এটুকু স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, গণের ধারক ও পালক যিনি হবেন তাঁর মধ্যে কল্যাণকারী এবং অসৎ-নিরোধী শক্তি উভয়ই বিদ্যমান। এই হ'ল গণেশের পিতামাতা শিব ও দুর্গা হওয়ার তাৎপর্য্য।

গণেশকে বলা হয় সিদ্ধিদাতা। তাঁকে পূজা করলে সিদ্ধি লাভ হয়। এই সিদ্ধি কী? বোধ হয়, মনস্কামনা-সিদ্ধি সম্পর্কেই কথাটার ব্যবহার হয়। কিন্তু সিদ্ধির মধ্যে আছে সিদ্ধ হওয়ার ভাব। সিদ্ধ হওয়া মানে কাজে, কথায়, চলায় দক্ষকুশল হওয়া। যে ব্যক্তি কুশল-কৌশলী হ'য়ে চলতে পারে, বলতে পারে, কাজ করতে পারে, সে জীবনে হ'টে যায় না, প্রতারিতও হয় না। এমনটি হ'তে কে না চায়? এমনতর চলন অধিগত করাই হল সিদ্ধিলাভ করা। গণপতি যিনি, সবার স্থিতি, ধারক ও পালক যিনি, তাঁর পূজার ভিতর দিয়ে তাঁর ঐ ধারণপালনী শক্তি আমাদেরও লাভ হয়।

গণেশ-উল্‌টানো ব'লে একটা কথা আমাদের সমাজে চালু আছে। ব্যবসায়ীরা গণেশপূজা করেন। তাঁদের গণেশ-উল্‌টানো মানে ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া। গণপাতা যিনি যিনি লোকবিনায়ক, তাঁর বিধানকে অবহেলা ক'রে যখন আমরা তার বিপরীত চলনে চলতে থাকি, তখনই আমাদের জীবনে গণেশ উল্‌টায়, তখনই জীবনে নেমে আসে হরেক রকমের বিপত্তি। তাই, গণেশ-উল্‌টানো মানে মানুষের কল্যাণবিধাতা

যিনি তাঁকে অবজ্ঞা করা, তাঁর বিধানকে তাচ্ছিল্য করা।

এখানে একটি কথা এসে পড়ে। গণপতির পূজা কেমন? রোজ সন্ধ্যায় তাঁর সামনে একটু ধূপধূনা দেওয়া বা প্রদীপ নাচানো? না কি বছরে একদিন খুব ধূমধাম সহ পাদ্য-অর্ঘ্য সহকারে গণেশ-পূজা করা?

চিন্তাজগতে আজ এক মহাবিপ্লব সৃষ্টি করে-ছেন যুগপুরুষ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র। আমরা অনেক কথা বলি, অনেক শব্দ ব্যবহার করি, কিন্তু সে-গুলির প্রকৃত তাৎপর্য্য অবগত নই। শব্দের সাধারণ-ভাবে চলতি যে অর্থ, তাই আমরা জানি ও ব্যবহার করি। কিন্তু পরম দয়াল শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন, শব্দের ঠিক অর্থটি পেতে গেলে তার ধাতুগত অর্থের উপরই দাঁড়াতে হবে। সেইজন্য যে-কোন শব্দ সম্পর্কে কথা উঠলেই শ্রীশ্রীঠাকুর তার ধাতুগত অর্থ দেখতে বলতেন। ধাতুগত অর্থকে আশ্রয় ক'রেই তিনি বের ক'রে দিয়েছেন শব্দের প্রকৃত অর্থটিকে। পূর্বে 'গণেশ' সম্পর্কে ধাত্বর্থগত যে আলোচনা আমরা করেছি তাও তাঁরই প্রসাদে প্রাপ্ত।

'পূজা' বলতে তাই শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র কেবল-মাত্র ধূপধুনা, ফুল, চন্দন সহযোগে সাময়িক একটা অনুষ্ঠান বোঝেন না। পূজাশব্দস্থিত পূজ্‌-ধাতুর মানে আছে সম্বর্দ্ধনা। এই কথা যেদিন তিনি শুনলেন, সোৎসাহে বলে উঠলেন, "এই ঠিক। যাঁকে পূজা করছি, তাঁর গুণাবলী নিজের জীবনে ও চরিত্রে মূর্ত্ত ক'রে তোলা চাই। তিনি যেমন চান সেইভাবে চ'লে তাঁকে অন্তরে বাড়িয়ে চলা-তেই হয় পূজার সার্থকতা।" এ না ক'রে হাজার নৈবেদ্য সাজাই আর আলোর রোশনাই করি, তাতে পূজা হবে না। গণেশপূজা মানেও হ'ল, গণপতির চলন-চরিত্র, তাঁর ধারণ-পালনী সম্বেগ নিত্য অনুশীলনের মধ্য দিয়ে নিজের জীবনে মূর্ত্ত ক'রে তোলা। যে চলনে গণেশ গণ-ঈশ হ'য়ে উঠেছেন, আমাকেও সেই চলনে চলতে হবে। তাহ'লে সেটা শুধু দিনের মধ্যে দু'চার মিনিট বা বছরে একদিন হৈ-হৈ ক'রে সারার ব্যাপার নয়। এই অনুশীলনের জন্য প্রতিক্ষণে প্রয়োজন একানু-রক্তি, তীব্রতা ও ক্রমাগতি। এই তিনের সমন্বয়ী চলনই মানুষকে পৌঁছে দিতে পারে সিদ্ধির সিংহ-

দ্বারে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল গণেশের গজমুণ্ড কেন? মুণ্ডের এরকম বিকৃতি তো আর কোন দেবতার দেখা যায় না? কথিত আছে, শনির দৃষ্টিতে শিশু বয়সে গণেশের মস্তক বিচ্ছিন্ন হওয়ায় সেখানে তাড়াতাড়ি এক হস্তীর মুণ্ড এনে জোড়া দেওয়া হয়। শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছিলেন, "একটা মানুষের বিশেষতঃ একটা শিশুর ঘাড়ে একটা হাতীর মাথা এনে বসানো সম্ভব কিনা তোমরাই ভেবে দেখ।" সাধারণভাবে ভেবে দেখ-লেই তো বোঝা যায়, এটা একেবারে অবাস্তব ব্যাপার। অথচ গণেশের বন্দনা, প্রণাম, ইত্যাদি জায়গায় 'গজানন' 'গজেন্দ্রবদন' প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ আছে। তাহ'লে তার মানে কী? প্রশ্ন করা হ'লে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন, "শ্রেষ্ঠ-অর্থে গজ শব্দ। শ্রেষ্ঠ মস্তিষ্ক যাঁর, তিনিই গজানন। আর, যিনি সবাইকে ধ'রে রাখেন, পালন করেন, পরি-চালনা করেন, তাঁর মস্তিষ্ক তো নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ।" পরমপ্রেমময় দয়াল ঠাকুরের এই উক্তির মধ্য দিয়ে আমরা গণেশের গজবদনের তাৎপর্য্য খুঁজে পাই।

আমাদের পুরাণের অনেক কাহিনীই রূপক ও উপকথার মোড়কে আবৃত, কল্পনার শাখাপুষ্পে পল্লবিত। ঐসব রহস্য উন্মোচন ক'রে যথার্থ ব্যাখ্যাটি বুঝতে না পারা পর্য্যন্ত আর্য্যকৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রকৃত রূপটি ধরা যাবে না। যুক্তিবাদী মনের কাছে এই-সব আজগবী অবাস্তব কাহিনীগুলি বর্জ্জনীয় ব'লে মনে হবে। কাল এগিয়ে চলেছে। পঞ্চাশ বছর আগে যা' অসম্ভব ছিল, এখন আর তা' অসম্ভব নেই। যে-কোন কথা, যে-কোন বিষয় বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য্য-সহকারে উপস্থাপিত করতে না পারলে বর্তমানের শিশু-মানসও তা' গ্রহণ করতে চায় না। শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র বিকশিত হয়েছেন বিংশ শতাব্দীতে। এই বিংশ শতাব্দীর ঠাকুর তিনি। তাই, সব কথাই তিনি তুলে ধরেছেন যুক্তিসহকারে, যাতে প্রকৃত অনুসন্ধিৎসু মন সত্যের সন্ধান লাভ করতে পারে। ধর্ম্মজগতে বা কৃষ্টির প্রতিষ্ঠার পথে যেখানে যা' কিছু ধোঁয়াশার সৃষ্টি হ'য়ে আছে, যেখানে যা' কিছু দুর্বোধ্য, সব অপসারিত ক'রে তিনি আজ দৃষ্টিকে স্বচ্ছ ক'রে দিয়েছেন। দেবদেবী সম্পর্কেও যে আমাদের কত বিকৃত ধারণা ও চিন্তার

অস্পষ্টতা আছে আছে তার ইয়ত্তা সেই। সে-গুলিকেও আজ পরিষ্কার ক'রে চোখের সামনে এনে দিয়েছেন যুগন্ধর পুরুষ পরম দয়াল শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র। তাঁর বিভিন্ন সময়ে কথিত গণেশ সম্পর্কে উক্তিগুলি নিয়ে আজ এখানে আমরা গণেশ দেবতার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়ার চেষ্টা করছি।

গণেশের গজমুণ্ডের তাৎপর্য্য তো বোঝা গেল। গণেশের চিত্রে বা প্রতিমায় দেখা যায়, হস্তীমুণ্ডের দুপাশে দুটি দাঁত—যেমন হাতীর থাকে আর কি! অথচ গণেশের প্রণাম-মন্ত্রে আছে 'একদন্তং মহা-কায়ং'। তাহ'লে একদন্ত কেন? দুই দন্তের উল্লেখ নেই কেন? এর তাৎপর্য্যই বা কী? প্রশ্ন রাখা হ'ল পরমপুরুষ শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে। তিনি বল-লেন, "দ্যাখ্ তো দন্ত মানে কী?' আমরা সবাই জানি, দন্ত মানে দাঁত। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে ওভাবে শব্দের অর্থ বললে হ'ত না। উল্লেখ করতে হ'ত শব্দের ধাতুটি এবং সেই ধাতুর অর্থ। ধাতু হচ্ছে শব্দের উৎস বা কারণ। শ্রীশ্রীঠাকুর স্বয়ং কারণপুরুষ। তাই, তাঁর কথা, কাজ, চিন্তা সবই উৎসমুখী। উৎসের দিকে, কারণের দিকে তিনি

আমাদের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিয়েছেন।

যাই হোক, অভিধান দেখে বলা হল, দন্ত এসেছে দম্-ধাতু থেকে, অর্থ দমন, নিয়ন্ত্রণ। শুনেই শ্রীশ্রীঠাকুর উৎফুল্ল হ'য়ে উঠে বসলেন। বললেন, "ঐ ত্থাখ্। তাহ'লে দন্ত মানে দমনকারী। 'এক দন্ত' মানে একমাত্র দমনকারী বা নিয়ন্ত্রণকারী।" গণপতি যিনি, তিনি সুদক্ষ লোকপালক। সবার অস্তিত্বকে তিনি বৈশিষ্ট্য-অনুপাতিক পালন-পোষণ করেন, যা' যেখানে সত্তাবিরোধী চলন তাকে তিনি সুনিয়ন্ত্রিত করেন, অসৎ বা অকল্যাণ যা' তাকে তিনি দমিত ও সংযত করেন। এই হ'ল তাঁর 'একদন্ত' নামের সার্থকতা।

গণেশমূর্ত্তিতে দেখা যায়, গণেশের হাত চার-খানি। কেন? শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র ব্যাখ্যা দিলেন—চার হাত মানে তাঁর চারদিকে লক্ষ্য। তাঁর চারপাশে তিনি সমান নজর রেখে চলেন। কোন দিক দিয়ে কোন অসুবিধা যাতে না আসে, কোন ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতার আক্রমণে বিব্রত হ'তে না হয়, সেইজন্য তিনি সবদিকে লক্ষ্য রাখেন।

চারিদিকে দেখে চলার এই স্বভাবকে শ্রীশ্রীঠাকুর

বলেছেন চতুরতা। সংস্কৃত 'চতুর' মানে চার। তার সঙ্গে সম্বন্ধান্বিত ক'রেই শ্রীশ্রীঠাকুর বাংলা চতুর-শব্দ ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেন, চতুর সে-ই, যে চার আল (সীমানা) দেখে চলে, চারদিকে যার তীক্ষ্ণ নজর থাকে। দেবতার চার হাতের ব্যাখ্যা শ্রীশ্রীঠাকুর এইভাবেই দিয়েছেন।

গণেশের বাহন মূষিক বা ইঁদুর। তার অর্থ, ইঁদুরের মত খল ক্ষতিকারক স্বভাবের যারা, গণ-পতি তাদিগকে অধীনে রাখেন। দুষ্ট প্রকৃতির মানুষ যারা, তাদের আমরা এড়িয়ে চলি, তারা অন্যায় করলে শাস্তিবিধান করি। তাদের কাছ থেকে কোন উপকার যে পাওয়া সম্ভব তা' আর বুঝতে পারি না। কিন্তু মূষিক বাহন করার ভিতর দিয়ে গণপতির চরিত্রের এই বিশেষ দিকটি প্রকটিত হ'য়ে উঠেছে যে, তিনি কাউকে বাদ দেন না। প্রকৃত লোকনেতা যিনি, তিনি দুষ্টকেও বাদ দেন না। বরং তাকে তার ঐ ব্যাধি থেকে মুক্ত ক'রে তুলতে ব্যবস্থা দান করেন। গণ নিয়েই তাঁর কারবার। গণের অধিপতি তিনি। তাই, তিনি সবরকম লোককে বহন, পোষণ ও ধারণ করেন।

যার দ্বারা কোন কাজ হবে না ব'লে আমরা মনে করি, তাকেও তিনি সৎ ও শুভ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেন।

এর মধ্যে আরো একটি মনস্তত্ত্ব কাজ করছে। শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র বলেছেন, চোর, বদমাইস, গুণ্ডা যেই হোক, নারীদের মধ্যেও যদি কেউ বেশ্যা, দুষ্টা, কলঙ্কিনী থাকে, তাদের মনের তার যদি উঁচু গ্রামে বেঁধে দেওয়া যায়, কোনভাবে যদি তারা শ্রেয়-অনুরাগসম্পন্ন হ'য়ে উঠতে পারে, তাইই তাদের বাঁচার পথ। শ্রেয় বা শ্রেষ্ঠের প্রতি ভালবাসাই আনতে পারে তাদের জীবনের পরিবর্তন। তারা যদি শ্রেষ্ঠের সেবায় নিয়োজিত হয়, তাঁর আদেশ পালনে তৎপর হয়, তখন তারাও সৎ ও পবিত্র জীবনের অধিকারী হ'য়ে উঠতে পারে।

গীতায়ও বলেছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ—অতি দুরাচারী ব্যক্তিও যদি অনন্যচিত্ত হয়ে আমার ভজনা করে, তাহ'লে সে ধীরে ধীরে সাধু হ'য়ে ওঠে (গীতা, ৯/৩০)। এই হ'ল মূষিককে বাহন করার তাৎপর্য্য।

গণেশ মাতৃভক্ত। একবার মা-দুর্গার গলায়

একটি মুক্তার মালা দেখে মায়ের দুই ছেলে কার্তিক ও গণেশ দুজনেই মালাটি পাওয়ার জন্য আবদার জানায়। মা কাকে দেবেন মালা? দুজনকে বল-লেন, 'যে আগে পৃথিবী প্রদক্ষিণ ক'রে আসতে পারবে, আমি তাকে মালাটি দেব।' মায়ের ইচ্ছা জেনে কার্তিক তখনই ময়ূরে চড়ে বিশ্ব-প্রদক্ষিণে বেরোলেন। গণেশ মায়ের সামনেই বসেছিলেন। তিনি উঠে মায়ের চারপাশে একবার ঘুরে এসে চুপ ক'রে ব'সে রইলেন। তাঁর কাছে মা-ই সব। মা-ই পৃথিবী। কিছুক্ষণ পর কার্তিক এসে গণেশকে ব'সে থাকতে দেখে বললেন, 'কই মা! গণেশ যায় নি?' মা বললেন, 'হ্যাঁ বাবা, গণেশ অনেকক্ষণ ঘুরে এসেছে।' মুক্তার মালাটি গণেশই পেলেন। গণ-পালকের এই মাতৃভক্তি সহজ ও স্বাভাবিক।

গণপতি মানুষের অস্তিত্বকে পোষণ দান করেন, কিন্তু কারো বৈশিষ্ট্যকে নষ্ট করেন না। গণপতি-পূজা করলে মানুষ সহজাত সংস্কারগত বৈশিষ্ট্যে উচ্ছল হ'য়ে উঠবেই। কারণ, গণপতি যিনি, তিনি জানেন, মানুষের সত্তাগত বিশেষত্বের বিকাশ যদি না হয়, তবে সে মানুষ হ'য়ে পড়বে কিম্ভুতকিমাকার

জরদ্‌গব। তাই তিনি ঐদিকের উপর ভিত্তি ক'রেই মানুষকে পালন-পোষণ করেন। তাঁর পোষণ শুধু খাওয়া-পরা দিয়ে পোষণ নয়, সাত্বত পোষণ।

এতক্ষণ আমরা গণপতির সম্বন্ধে জানলাম, বুঝলাম গণেশপূজার তাৎপর্য্য। এখন জানতে হবে, এই গণপতি বা গণেশ কে? তিনি কি ঐ যে মূর্ত্তি দেখা যায় তাই? না। তিনি মানুষ, নরদেহধারী। তিনি বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ সদ্‌গুরু, যিনি জগৎ-কল্যাণে যুগে যুগে আবির্ভূত হন। তিনিই পরম-পুরুষ, গণপাতা, লোক-উদ্ধাতা। তাঁর মধ্যেই গণ-পতিত্ব মূর্ত্ত ও অভিব্যক্ত। আর তাঁকে ভালবেসে অনুসরণ করে যারা, তাদের মধ্যেও গণপতিভাবের কমবেশী বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়।

কালী

আমরা সাধারণতঃ মা-কালীর যে-রূপ দেখে থাকি তা' ভীষণাকৃতি। মহাদেবের বুকের উপর তিনি জিভ বের ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন। গলায় তাঁর নরমুণ্ড। তিনি নরহস্তনির্ম্মিতমেখলাপরিহিতা, ভীমদশনা, শিবাপরিবেষ্টিতা। তাঁর চারিটি হাতে খড়্গ, নরমুণ্ড এবং বরাভয়।

কালী যেন চিররহস্যাবৃতা। ঘোর অমাবস্যার গভীর রাতে তাঁর পূজা সম্পন্ন হয়। প্রহরে প্রহরে পুরোহিত ভাবগম্ভীর স্বরে মন্ত্র উচ্চারণ করেন। নিস্তব্ধ নিশীথিনীর জড়নিদ্রার আবরণ ছিন্ন ক'রে ধ্বনিত হয়ে ওঠে—

'কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী।'

এই কালী কে? কথিত আছে, তিনি দুর্গাদেবীর ললাট থেকে আবির্ভূতা দেবীবিশেষ। চণ্ড-নামক অসুরকে বধ করার সময় মায়ের মুখ ক্রোধে কৃষ্ণবর্ণ হ'য়ে উঠলে তাঁর ললাটদেশ থেকে করাল বদনা, অসিপাশযুক্তা এই কালী আবির্ভূতা হন।

এর দ্বারা এটুকু জানা যাচ্ছে যে, মা-কালী মা-দুর্গারই অপর এক রূপ। সে-রূপ অসৎ-বিনাশার্থে 'জিহ্বা-ললনভীষণা' ভয়ঙ্করী শ্যামা।

দৃপ্ত দানবগণ যখন পৃথিবীতে প্রবল হ'য়ে ওঠে, সৎ ও সাধু ব্যক্তিগণ যখন তাদের দ্বারা নির্য্যাতিত হন, ধরণীর স্বস্তি যখন বিড়ম্বিত ও বিধ্বস্ত হ'তে থাকে, তখন জীব-অস্তিত্বরক্ষায় আবির্ভূতা হন মহা-কালী।

জীবের জীবনগতি যখন স্তব্ধ হ'য়ে আসে, প্রবৃত্তির পাষাণচাপে মনমরা হ'য়ে মানুষ যখন দিন কাটাতে থাকে, আলস্য, অবিশ্বাস, অকৃতজ্ঞতা ও আত্মম্ভরিতায় ডুবে থেকে যখন সে নিজেকে সঙ্কুচিত ক'রে তোলে, ফলে আর পথ চোখে দেখতে পায় না, তখনই প্রয়োজন হয় কালীর আরাধনার। কারণ, কালীর বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই আছে সকল প্রকার নিথ-রতা অপসারিত ক'রে জীবনে সাত্বত গতিবেগ সঞ্চা-রিত করা।

ইং ১৯৫৬ সালে নভেম্বর মাসে কালীপূজার দিনে সন্ধ্যার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের নিকটে দেওয়ালী ও মা-কালী সম্পর্কে কথাবার্তা চলছিল।

কথাপ্রসঙ্গে তিনি বললেন, "কালীর মধ্যে কল্ (ধাতু) আছে। কল্ মানে কী রে?" অভিধান দেখে বলা হ'ল, কল্-ধাতুর মধ্যে আছে গতি, গণনা, শব্দ, সংখ্যান। শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন, "আমার মনে হয়, কালী মানে সংখ্যায়নী গতিসম্পন্না যিনি।" অর্থাৎ গুণিত হ'তে হ'তে বেড়ে চলেন যিনি। কী গুণিত হয়? মায়ের যা' সত্তাসম্পদ অর্থাৎ মায়ের স্নেহমমতা, কল্যাণময়ী প্রকৃতি, সত্তাসংঘাতী শক্তির বিরুদ্ধে পরাক্রম, তাইই গুণিত হয়। মায়ের পূজা যারা করে, মাকে যারা ভালবাসে, তাদের ভিতরে এইসব গুণ বৃদ্ধি পায়, অন্তরে তাদের মহাশক্তির জাগরণ ঘটে।

মা-কালীকে শক্তিও বলা হয়। শক্তির উপাসনা যারা করে তাদের নাম শাক্ত। এ শক্তি হ'ল জীবনীশক্তি। মানুষ যখন নির্ব্বীর্য্য, ক্লীব ও নিকর্ম্মা হ'য়ে পড়ে, তখন শক্তির উপাসনায় সে ফিরে পায় জীবনের গতিবেগ, কর্ম্মক্ষমতা, সাহস, শক্তি ও শৌর্য্য। জীবনীশক্তির অভাবে মানুষের অন্তর-সম্পদ নিষ্প্রভ হ'য়ে পড়ে, তার প্রাণোচ্ছলতা থাকে না। আর, শক্তি-আরাধনায় শক্তি জেগে ওঠে।

শক্তিপূজাকে কেউ কেউ অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে। শোনা যায়, আগেকার দিনে নাকি ডাকাতরা কালীপূজা ক'রে ডাকাতি করতে বের হ'ত। আবার বর্ত্তমানেও মা-কালীকে সামনে রেখে কিছু উচ্ছৃঙ্খল মানুষ যেভাবে টুইস্ট নাচ, মদ্যপান ও নানারকম অশালীন হৈ-হুল্লোড় করে, তাকেও শক্তিপূজার মহিমা-প্রচার বলা যায় না। বরং তা' অন্তঃস্থ অনিয়ন্ত্রিত নীচ প্রবৃত্তিরাজির আগলভাঙ্গা বহিঃপ্রকাশ মাত্র। সেইজন্য ঐ পূজকদের অন্তরে দিব্যভাবের জাগরণ কিছুই দেখা যায় না। উপরন্তু, গুরুজন ও মহিলাদের সামনে এরকম অশোভন শ্রদ্ধাহীন আচরণ চরিত্রের অধোগতিকেই প্রকট ক'রে তোলে। সেইজন্য এখন শক্তিরূপা দেবীকে আসনে বসিয়ে পুষ্প বিল্বপত্রাদি সহকারে সাড়ম্বরে পূজার অনুষ্ঠান করা হয় বটে, কিন্তু ফল কী দেখছি?—শক্তিবৃদ্ধির বদলে আমরা দিন দিন শক্তিহীন হ'য়ে পড়ছি। অসৎ-এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার শক্তি আজ আমাদের নেই, বংশমর্য্যাদা ও আভিজাত্য সম্পর্কে আমরা সচেতন হ'য়ে উঠতে পারছি না, মা-বোনের সম্মান নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে আমাদের বাধে না, কথায়

কথায় অপরকে আঘাত করতে, এমন কি, জীবন-হনন করতেও আমরা পিছপা হই না। এই কি শক্তিপূজার ফল? যিনি বিশ্বপ্রসবিনী, কল্যাণী কালী, তাঁর পূজা ক'রে কি মানুষ হৃদয়হীন হয়, তার চরিত্রের অধঃপতন ঘটে? বরং মানুষ বেড়ে ওঠে তেজে-বীর্য্যে-পরাক্রমে। তার অন্তর থেকে দূর হ'য়ে যায় অন্যায়ের প্রতি মোহ, অসৎ চলনে চলার প্রবৃত্তি। তার অন্তরের দম্ভ, অভিমান, কুক্রিয়াশক্তি, আত্মসুখপরায়ণতা, প্রভৃতি অবগুণগুলির অবলোপ ঘটে। যদি তা' না হয় তবে বুঝতে হবে, কল্যাণময়ী কালীর পূজা সেখানে হয় নি।

আরো একটি ব্যাপার পূজাস্থানে ঘটতে দেখা যায়। তা' হ'ল মাইকে কুরুচিপূর্ণ যৌনভাবোদ্দীপক নানারকম চটুল সঙ্গীত বাজানো। একবার দেওঘরে কালীপূজার সময় মাইকে ঐ ধরনের গান খুব শোনা যাচ্ছে। একজন একটু খুশী মনেই বললেন, 'পূজার ওখানে খুব মাইক বাজছে।' তা' শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর কোনরকম আনন্দ প্রকাশ করলেন না। একটু গম্ভীর হ'য়ে বললেন, "পূজার আগে বা পরে পূজামণ্ডপে ভাবভক্তির সহায়ক গানবাজনা চলতে পারে; কিন্তু

ঐ ভাবের বিরুদ্ধে বা কোনরকম অসৎ উত্তেজনা সৃষ্টিকারী কোন গান দেবতাসান্নিধ্যে কখনও করা উচিত নয়।" করলে, পূজার পবিত্র ভাবটাই নষ্ট হ'য়ে যায়। দেবতার উপরে শ্রদ্ধাও গজায় না। আর, শ্রদ্ধার উদ্ভব না হলে পূজাতে কখনও সংবর্ধনা আসে না।

আমরা যে কালীমূর্তি দেখতে অভ্যস্ত তা' ভয়-উৎপাদক সংহারমূর্তি। তিনি মুণ্ডমালাবিভূষিতা, চতুর্ভুজা, মুক্তকেশী, উলঙ্গিনী, শ্যামা, মহারবা। এটি তাঁর একটি রূপ। কিন্তু এটিই একমাত্র রূপ নয়। তিনি আবার প্রসন্না, হাস্যমুখী। তাঁর দুই হাতে যেমন খড়্গ ও নরমুণ্ড—ধ্বংসের প্রতীক, অপর দুই হাতে আবার বর ও অভয়—তাঁর পদাশ্রিত সন্তানগণের জন্য। মায়ের আছে আট যোগিনী। তাদের মধ্যে ছয়টির নাম হ'ল ভীষণা, চণ্ডী, করালা, শূলিনী, হন্ত্রী, ত্রিপুরা। এগুলি যদি আমরা প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করি তাহ'লে বলা যায়, এ সবই হ'ল অকল্যাণকে নিরোধ করার জন্য মায়ের শক্তি। অসৎ-এর বিরুদ্ধে, আসুর প্রবৃত্তির দমনে তিনি প্রচণ্ডা। এ ছাড়া আরো দুটি যোগিনী আছে, তাদের নাম কর্ত্রী এবং

বিধাতৃকা, মানে যে-শক্তি সব কিছু গ'ড়ে তোলেন, সাজিয়ে দেন। বিশ্বসংসার যেভাবে বিন্যস্ত হ'লে সুশৃঙ্খল এবং সুষ্ঠুচলৎশীল থাকে, মা-কালী তাই করেন। আবার, স্বীয় সন্তানের জন্য তিনি বাৎসল্য-পরায়ণা। তাই, কালী একাধারে যেমন জীবন-সংরক্ষক, তেমনি আবার জীবনকে যা' দলিত-মথিত করে তার সংহারক। তিনি যেমন 'ভয়দা', তেমনি আবার 'ভয়নাশিনী'।

মায়ের সাথে যে যুক্ত থাকে, মাকে যে বিশ্ব-প্রসবিনী ব'লে ভাবে, মায়ের কল্যাণময়ী মূর্ত্তি সে উপলব্ধি করতে পারে। স্বীয় আচরণের মধ্যে দিয়ে তা' ক'রে দেখিয়ে গেছেন রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, বামা ক্ষেপা, প্রভৃতি সাধকগণ। এঁরা মা-কালীকে এমনই আপন ভাবতেন যে তাঁর সাথে এঁদের রাগ, অভিমান, সোহাগ, সব-কিছুর পালা চলত। তাঁদের কাছে মা-কালী শুধু মাটি বা পাথরের মূর্ত্তি নন। দেবভাবে তাঁরা আবিষ্ট। মায়ের মহিমা ও গুণ-বৈশিষ্ট্য অনুশীলন ও আচরণের ভিতর দিয়ে তাঁরা স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী নিজ নিজ প্রাণে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাই, তাঁদের কাছেই প্রকৃত হ'য়ে উঠেছে

প্রতিমায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা। রামপ্রসাদ তো প্রাণ খুলে গাইলেন—

"মায়ের মূর্ত্তি গড়াতে চাই মনের ভ্রমে মাটি দিয়ে,/মা বেটি কি মাটির মেয়ে? মিছে খাটি মাটি নিয়ে।"

পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকটেও মৃন্ময়ী কালী চিন্ময়ী হ'য়ে উঠেছিল। ঠাকুরের কাছে তিনি শুধু কৃষ্ণবর্ণা পাষাণী কালী নন। সেই "কালো মেয়ের পায়ের তলায়" তিনি "আলোর নাচন" দেখতে পান।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রও বলেছেন, "মা আমার দীপান্বিতা"। মা-কালীর মধ্যে তিনি নিজের মাকেই প্রত্যক্ষ করেছেন। একবার ছাত্রাবস্থায় তিনি এক সঙ্গীর সাথে দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণীমন্দিরে যান। তখন দ্বিপ্রহরের পূজা সাঙ্গ হয়েছে। উপস্থিত সবাইকে প্রসাদ বিতরণ করা হ'চ্ছে। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসাদ পাওয়ার আগেই মন্দিরের দরজা বন্ধ হ'য়ে গেল। তখন আর প্রসাদ দেওয়া হবে না। কিন্তু ঠাকুর তখন ক্ষুধার্ত্ত। প্রসাদ না পেয়ে অভিমানে তিনি মন্দিরের বারান্দায় একটি গাছের ছায়ায় যেয়ে শুয়ে-

ছেন। ধীরে ধীরে ঘুমিয়েও পড়লেন। তারপর স্বপ্ন দেখছেন—মা আসছেন, শ্যামা, এলোকেশী, সিঁথিতে সিঁদূর, লালপেড়ে শাড়ী পরা। তাঁর এক হাতে এক গ্লাস জল, আর এক হাতে একটা রেকাবীতে বরফি সন্দেশ। এই রূপ বর্ণনা করতে করতে শ্রীশ্রীঠাকুর বহুবার বলেছেন, "দেখতে একেবারে ঠিক আমার মায়ের মত।" মা এসে আস্তে আস্তে ব'সে শ্রীশ্রীঠাকুরের মাথাটি কোলে নিয়ে তাঁর মুখের কাছে সন্দেশ ধ'রে আদর ক'রে বলছেন, 'খা'। ঠাকুর অভিমানভরে বলছেন, "না, আমি খাব না। তখন আমার খিদে পেয়েছিল। কিন্তু তখন আমাকে প্রসাদ দেওয়া হ'ল না কেন? আমি আর খাব না।" তখন মা সস্নেহে হেসে বললেন, "অত লোকের সামনে কি আমি আসতে পারি?" এর পর মা ব'সে ব'সে পরম আদরে ঠাকুরকে ঐ সন্দেশ আর জল খাওয়ালেন। ঘুম ভেঙ্গে উঠে শ্রীশ্রীঠাকুর বোধ করছেন যে তাঁর খিদে বা পিপাসা কিচ্ছু নেই। কিছু পরে তিনি দক্ষিণেশ্বর থেকে কলকাতায় চ'লে এলেন। ভেতরটা তাঁর এমনই হ'য়ে ছিল যে কলকাতা পর্যন্ত হেঁটে আসার পরেও তাঁর কোন খিদে

বা পিপাসার বোধ ছিল না।

এ মা কি রহস্যাবৃতা ভয়ঙ্করী শিলামূর্ত্তিমাত্র? যার সে উপলব্ধি নেই, তার কাছে তাই। কিন্তু উপলব্ধিবান ব্যক্তিত্বের কাছে তিনি চিরস্নেহময়ী সন্তানমঙ্গলবিধায়িনী জননী। তাই, ইং ১৯৫৬ সালের ২রা নভেম্বর দেওয়ালির দিনে পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র অনবদ্য এক ছন্দে প্রদান করলেন এক মহাবাণী—

"আজ দীপালি,
মা আমার দীপান্বিতা,
মা আমার জীবন-আলোক,
মায়ের এক হাতে অসৎ-নিরোধী অসি,
অন্য হাতে বর ও অভয়—
বাৎসল্যের পরম আশ্রয়,
তাই মা শিবানী, শুভানী,
আমার মা কল্যাণী কালী,
সত্তার সাত্বত সম্বেগ—
অস্তিত্বের অমৃত-উৎস—
জীবনের যোগ-নর্ত্তনা,
সে এই যে
আমার মা।"

ইষ্টানুগ মাতৃভক্তি যার জীবনে অটুট থাকে, পূজার বেদীতে প্রতিষ্ঠিতা প্রতিমা তার কাছে স্বীয় গর্ভধারিণীরই প্রতিরূপ হ'য়ে ধরা পড়েন। মা-কালী তার কাছে আর কালোরূপা থাকেন না। তিনি হ'য়ে পড়েন "দীপ-অন্বিতা" (দীপান্বিতা), উজ্জ্বলবরণা। দানবনিধনার্থে তাঁর মহাভৈরবী রুদ্রমূর্ত্তি দেখে তাঁর সন্তান কখনও ভয় পায় না। সন্তান তো জানে, এ আমার মা, দুষ্টকে শাসন করছেন। তাঁর ঐ রূপ দেখে আতঙ্কগ্রস্ত হয় পাপীরা। অপরাধবোধ যাদের আছে, তারাই মায়ের ভয়াল মূর্ত্তিতে ভয় পায়। যেমন সিংহী যখন গর্জ্জন করে, মানুষের বা অন্যান্য পশুদের তখন ভয়ে প্রাণ শুকিয়ে যায়। কিন্তু ঐ সিংহীর বাচ্চাটি মনের আনন্দে মায়ের কাছেই খেলা করে, মা হাঁটলে মায়ের পায়ে-পায়েই ঘুরতে থাকে। তার বুক কাঁপে না। কারণ, সে জানে এ তো আমার মা।

মা-কালীর বীজমন্ত্রে 'হূং' ও 'হং' ধ্বনি পাওয়া যায় এই ধ্বনি বা নাদ হুঙ্কারেরই প্রতীক। দানব-দলনকালে প্রচণ্ডা ওজস্বিনী মহাকালী ঘন ঘন হুঙ্কারে তাদের প্রাণে ত্রাস সৃষ্টি করছেন। তাই, অমনতর

ধ্বনির সৃষ্টি।

রক্তবীজ নামক অসুরের রক্ত যাতে মাটিতে প'ড়ে আবার সহস্র সহস্র অসুরের সৃষ্টি করতে না পারে, সেইজন্য মা জিহ্বা বিস্তার ক'রে সেই রক্ত পান করেছেন। এই কারণে তাঁর বিস্তৃত জিহ্বার কল্পনা করেছেন সাধকগণ। সেই সাথে মহাকালী গ্রাস করেছেন অন্যান্য অসুরকেও। এই কলন বা গ্রাস করা অর্থ থেকেও তাঁর নাম 'কালী' হয়েছে।

কালী-প্রতিমায় আমরা দেখি, মহাকালী রণ-রঙ্গিনী মূর্তিতে মহাদেবের বুকের উপর দাঁড়িয়ে আছেন। এ নিয়ে কত সাধক কত গান গেয়েছেন, কত ভাবুক কত ব্যাখ্যা করেছেন তার অন্ত নেই। কেউ বলেছেন, কালী শিবের সাথে 'বিপরীতরতাতুরা' (বিপরীত রতিতে আসক্তা)। কেউ বলছেন 'কালী শিবারূঢ়া নন, শবারূঢ়া'। তার মানে রণনির্জ্জিত দৈত্যগণের দেহের উপর দিয়ে মহাকালী চলেছিলেন। আর দৈত্য-দানব-মানুষ-পশুপক্ষী-কীটপতঙ্গ যে কোন প্রাণীই তো সেই এক বিশ্বপিতা মহাদেবের অংশ-বিশেষ। শিবের বুকে কালী সেই শবাসনা অবস্থারই

প্রতীক মাত্র। এইরকম বহু ব্যাখ্যান আছে। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক ব্যাখ্যা আমরা পেলাম পরমদয়াময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের কাছে। সেই কথাই এবার বলি—।

শিবের বুকের উপরে দণ্ডায়মানা কালী—এটা সৃষ্টিতত্ত্বের প্রাথমিক পর্য্যায়ের একটা ইঙ্গিত। সাংখ্য-মতানুসারে, পুরুষ অক্রিয় (শব)। প্রকৃতির সংস্পর্শে তিনি সক্রিয় হ'য়ে ওঠেন। তখন সৃষ্টি সুরু হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন, পুরুষ স্থাস্নু বা স্থিরধর্ম্মী, ইংরাজীতে বলে 'পজিটিভ্' ; আর নারী চরিষ্ণু বা চর-ধর্ম্মী—'নেগেটিভ'। এই পজিটিভ ও নেগেটিভ-এর পারস্পরিক মিলনেই হয় সৃষ্টির সূচনা। বৈদ্যুতিক আলো জ্বালাতে গেলে একটি পজিটিভ্ ও একটি নেগেটিভ্ তারের মিলন দরকার হয়। শুধু দুটি পজিটিভ্ তার বা দুটি নেগেটিভ তার একত্র ক'রে আলো জ্বালানো যায় না। আবার, লৌকিক সৃষ্টির বেলাতেও নারী (নেগেটিভ) ও পুরুষ (পজিটিভ) উভয়ের মিলনের প্রয়োজন হয়। বিশ্বসৃষ্টির প্রাক্-কালেও তেমনি পজিটিভ-শক্তি ও নেগেটিভ্-শক্তির মিলন। তারই প্রতীক ঐ পজিটিভ্ নিষ্ক্রিয়

শিবের বুকে নেগেটিভ্ চঞ্চলা কালীর পাদ-চারণা। শিব মানেই সকলের ও সব-কিছুর শয়ন-স্থান (শী ধাতু), অর্থাৎ যাঁর মধ্যে বিশ্বদুনিয়ার সব-কিছু অবস্থিত, অখণ্ড বিশ্বসত্তা। তা' এক এবং অদ্বিতীয়, তা' চিরকাল ছিল, আছে এবং থাকবে। কিন্তু তা' কখনই এই বিচিত্র শোভা নিয়ে দৃশ্যমান জগৎরূপে ফুটে উঠতে পারত না—যদি নাকি তার বক্ষে প্রকৃতির চরমানতা সংযুক্ত না হ'ত। প্রকৃতির সংস্পর্শেই পুরুষ সচল ও সক্রিয় হয়। উভয়ের সংযোগেই সৃষ্টি সম্ভব হ'য়ে ওঠে। শিব ও কালী সেই পুরুষ ও প্রকৃতি—পজিটিভ ও নেগেটিভ। এই হ'ল শিবের বুকে শ্যামার অবস্থিতির তাৎপর্য্য।

ঈশ্বর অনন্ত—বাক্য ও মনের অগোচর। তিনি অরূপ, অব্যয়, অদ্বিতীয়। মায়ামুগ্ধ জীবের পক্ষে তাঁকে ধারণায় আনা সুকঠিন। কারণ, কোন রূপের মধ্যেই যাঁকে সীমায়িত করতে পারা যায় না, তাঁকে ধারণা করা যাবে কিভাবে। তাই, তাঁর এক একটি জ্যোতির্ম্ময় গুণ নিয়ে এক এক দেবতার ভাব তৈরী হয়েছে, এবং সেই ভাব-অনুযায়ী হয়েছে সেই দেব-তার রূপকল্পনা; যেমন জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা

সরস্বতী, মহাশক্তির দেবতা কালী, জলদেবতা বরুণ, মৃত্যুর দেবতা যম, তাপের দেবতা অগ্নি, ধনাধিপতি কুবের, ইত্যাদি। এইভাবে সেই অসীম অরূপকে সাধক সীমায়িত রূপের মধ্যে দিয়ে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেন—যা' নাকি পরব্রহ্মেরই একটি দ্যুতি বা রশ্মি ("সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা")। মনে রাখতে হবে, দেবতার পূজার ভিতর দিয়ে ঈশ্বর-উপলব্ধিতে পৌঁছানোই আমাদের সাধনা।

কিন্তু জীবনের সূত্র কোথাও শক্ত বাঁধনে তথা উচ্চ গ্রামে বাঁধা না থাকলে দেবপূজাটা খেয়ালের পূজা হ'য়ে যেতে পারে। আর খেয়ালের পূজা হ'লে, দেবতা যেমন পছন্দ করেন, তাঁর যা' অভিপ্রেত, তদনুযায়ী আর তাঁকে সেবা করি না। আমার ইচ্ছা-অনুযায়ী তাঁকে সাজাই বা নাচন-কোঁদন করি, আমার পছন্দমত খাদ্য তাঁকে খাওয়াই, আমার সুবিধামত সময়ে তাঁকে ফুল-চন্দন দিয়ে পূজা সারি—সে বেলা এগারোটাতেই হোক আর একটাতেই হোক।

কিন্তু যে-ব্যক্তি জীবনে সদ্‌গুরু গ্রহণ করেছে এবং তাঁর প্রতি অবিচল নিষ্ঠা নিয়ে তাঁর আদেশ-পালনে উন্মুখ হ'য়ে চলতে সচেষ্ট, সে কখনও দেবতা

নিয়ে ছেলেখেলা করে না। সে জানে 'সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ'—গুরুর মধ্যেই সর্ব্বদেবতার অধিষ্ঠান। সেই-জন্য কোন দেবতাকেই অবহেলা করা যায় না। গুরুর উপর ভক্তি তাকে দেবতার উপরেও ভক্তি-মান ক'রে তোলে এবং দেবতাও সতাৎপর্য্যে তার বোধে উদ্ভাসিত হন।

শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদে আছে—

"যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থা প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥ (৬।২৩)
—দেবতার উপর ঐরকম ভক্তি থাকতে হবে। এমনতর যার থাকে সেই মহাত্মার নিকটেই গুহ্য অর্থসমূহ যথাযথভাবে প্রকাশিত হ'য়ে থাকে।

ইষ্টের বা সদ্‌গুরুর চরণাশ্রিত যে, সে তাঁর অনুকূল যা' তা' গ্রহণ ও পালন করে, এবং প্রতি-কূল যা' তাকে বর্জ্জন করে। ভক্তির মূলসূত্রই এই (—"আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যবিবর্জ্জনম্")। এমনটি হ'য়ে উঠতে পারলে পরিবেশের কোন স্রোত আর মানুষকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। তার জীবনতরী শক্ত অনুরাগরজ্জু দ্বারা বাঁধা আছে মহা-মহীরুহ-রূপ আদর্শের সাথে। এই কারণে যে-কোন

পূজার আগেই লাগে গুরুপূজা। গুরুপূজা না হ'লে কোন দেবতার পূজাই সিদ্ধ হয় না।

গুরুর উপর অচ্যুত নিষ্ঠা না থাকলে কিছুদূর অগ্রসর হবার পর সাধকের মনে অহঙ্কার আসতে পারে এবং সেই অহঙ্কার থেকে তার পতনও আসা সম্ভব। গুরুই হলেন ঈশ্বরের জীয়ন্ত বেদী। তাঁকে ভালবাসলে ঈশ্বরের সৃষ্টির সব যা'-কিছু উপরই প্রীতি জন্মায়। তখন কাউকে বড়, কাউকে ছোট ভাবার বুদ্ধি আসে না। আবার, এই গুরুকেন্দ্রিকতা না থাকলে একপেশে বুদ্ধিও এসে যাওয়ার খুব সম্ভাবনা। তখন কেউ বলে আমার শিব বড়, কেউ বলে আমার কৃষ্ণ বড়, কেউ বলে আমার দুর্গা বড়। আর অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠ যে, সে দেখে সমস্ত দেবশক্তিই সেই পরম একেরই বিভিন্ন রূপ, এক অদ্বৈত পরব্রহ্মেরই বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র! তার কাছে দেবতা সমস্ত মরকোচ-সহ উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠেন।

দেবায়ন

হিন্দু পুরাণাদিতে অজস্র দেবদেবীর উল্লেখ আছে। তাঁদের উক্তি ও লীলা সম্বন্ধেও কত কথাই না আছে। কিন্তু সব ব্যাপারটা আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়, বরং ধোঁয়াটে। যে ব্যাপারটি রহস্যঘেরা তার উত্তর ঠিকমত পাওয়া যায় না। ফলে, কিছু লোকের দেবদেবী সম্বন্ধে প্রগাঢ় বিশ্বাস বা ভয়-মিশ্রিত শ্রদ্ধা থাকলেও অধিকাংশ লোকেরই আছে অবিশ্বাস বা সন্দেহ বা উদাসীনতা।

অথচ দেবতাদের মাহাত্ম্য গ্রন্থাদিতে শুধু শুধু লেখা হয় নি। এর বিশেষ কারণ আছে। সেই কারণ ঠিকমত না জানলে যুক্তিবাদী মনের কাছে ঐসব কথা অলীক বা অবাস্তব ব'লে মনে হ'তে পারে।

পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের কাছে জ্ঞানী ও জিজ্ঞাসু ভক্তগণ বিভিন্ন সময়ে জানতে চেয়েছেন বিভিন্ন দেবতা সম্বন্ধে। উত্তরে দয়াল ঠাকুর সব কিছুরই 'কেন' ভেঙ্গে দিয়েছেন। যা' কিছু অস্পষ্ট, রহস্যাচ্ছাদিত, তাকে তিনি ক'রে

তুলেছেন সুবোধ্য ও সহজগ্রাহ্য।

যেমন একদিন শ্রীশ্রীচণ্ডীর বিষয়বস্তু নিয়ে কথা চলছিল। কথায়-কথায় উঠল ধূম্রলোচন-বধের কাহিনী। শুনতে শুনতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন, "ধূম্রলোচন বধ মানে আমার মনে হয়, ধোঁয়াটে দৃষ্টির অপসারণ।" ধূম্র মানে ধোঁয়া, আর লোচন মানে দৃষ্টি। যা' আমরা ভালভাবে দেখতে পেতাম না বা বুঝতে পারতাম না, তা' যখন পরিষ্কারভাবে দেখতে ও বুঝতে পারি, তখনই হয় ধূম্রলোচন বধ। শ্রীশ্রীঠাকুরের এইরকম বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায়, কিভাবে জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিত্যই আমাদের ভিতরকার ধূম্রলোচন বধ হ'য়ে চলেছে।

একদিন শীতলাপূজার তাৎপর্য্য নিয়ে কথা চলছিল। শীতলাদেবীর প্রণামমন্ত্রে আছে 'নমামি শীতলাং দেবীং রাসভস্থাং দিগম্বরীম্। মার্জ্জনীকলসোপেতাং শূর্পালঙ্কৃত-মস্তকাম্'। অর্থাৎ শীতলাদেবীর বাহন হচ্ছে গাধা, হাতে তাঁর ঝাঁটা ও কলস এবং মাথার উপরে কুলো। মায়ের এরকম রূপের কারণ কী? এত বাহন থাকতে মা-শীতলা গাধাকে বাহন নির্ব্বাচন করলেন কেন? এ সম্পর্কে

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্নিধানে যেসব হয়েছিল তা' এই-রকম—।

শীতলাপূজা করা হয় রোগশান্তির জন্য। যে-সব রোগ শরীরে যন্ত্রণা ও জ্বালার সৃষ্টি করে, যেমন ঘা, পাঁচড়া, ফোঁড়া, বসন্ত, গলগণ্ড, প্রভৃতি, তার উপশমের জন্যই শীতলাদেবীর আরাধনা করা হ'য়ে থাকে। ঐসব রোগে শুশ্রূষার জন্য চাই ঠাণ্ডা আবহাওয়া, ঠাণ্ডা পানীয়, সদাচার ও পরিচ্ছন্নতা। গাধার দুধ শীতলতাকারক; তাই মা-শীতলা গাধার উপরে উপবিষ্ট। তাঁর হাতে মার্জ্জনী অর্থাৎ ঝাঁটা।

ঐসব রোগ দেখা দিলে ঘরদুয়ার সবসময় পরিচ্ছন্ন রাখা একান্ত দরকার। ঝাঁটা হ'ল চারিদিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার প্রতীক।

আবার, মায়ের আর এক হাতে কলস। তার তাৎপর্য্য হ'ল কলসের মধ্যে থাকে জল। শরীর শীতল রাখতে শীতল জলের দরকার। তা'ছাড়া, বিছানা, কাপড়-চোপড়, বাসন-কোসন ধোওয়া, স্নান করা ইত্যাদি কাজে জল নিয়ত দরকার হয়। কলস হ'ল সেই জলপূর্ণ পাত্রের প্রতীক। আর, শীতলা

দেবীর মাথার উপরে কুলো। কুলো হাওয়া করার কাজে ব্যবহৃত হয়। শরীরে যন্ত্রণা করতে থাকলে তখন ঠাণ্ডা হাওয়ার প্রয়োজন হয়। কুলোর হাওয়া বেশ ঠাণ্ডা এবং জোরালো। তাই, মা শীতলার মাথায় কুলো।

বৈদ্যনাথ বলতে শিবঠাকুরকেই বোঝায়। শিবের নাম বৈদ্যনাথ হ'ল কেন? ধাতুগত অর্থের উপর দাঁড়িয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন, বৈদ্য এসেছে বেদ থেকে, আর বেদ এর উৎপত্তি বিদ্‌-ধাতু থেকে, মানে বিদ্যমানতা, জানা। তাহ'লে বৈদ্যনাথ মানে হ'ল বিদ্যমানতাকে অর্থাৎ অস্তিত্ব বজায় রাখার কৌশলকে যিনি জানেন সেই প্রভু। প্রতিটি সত্তার অস্তিত্ব যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, প্রতিপ্রত্যেকে যা'তে বাঁচা-বাড়ার পথে উচ্ছল হ'য়ে চলতে পারে, তা' যিনি জানেন তিনিই বৈদ্যনাথ। তাই, বাবা বৈদ্যনাথের পূজা মানে সর্ববৈশিষ্ট্য প্রতিটি সত্তার রক্ষণ ও বর্দ্ধনার তুক সম্যক অধিগত করা। আর, তা' পারা যায় একমাত্র বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ সদ্‌গুরুকে আশ্রয় ক'রে তাঁ'র নির্দেশ পালনের মধ্য দিয়ে। জীবন্ত বৈদ্যনাথ তিনিই। তাঁর পূজা মানে তিনি যাতে

প্রীত হন তেমন চলনে চলা, তাঁকে সম্বর্ধিত ক'রে তোলা নিজ জীবনে ও চরিত্রে। একমাত্র তিনিই পারেন প্রতিটি সত্তাকে তা'র বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখে জীবনবৃদ্ধির পথে চালিত করতে।

সেইজন্য, সপারিপার্শ্বিক জীবনীয় উদ্বর্দ্ধনা নেই, মানুষকে সওয়া-বওয়ার বালাই নেই, বরং হিংসা-লোভ ইত্যাদি রিপুগুলির দাপাদাপি আছে, অথচ বৈদ্যনাথ মন্দিরে যেয়ে দণ্ডী কাটে বা বাবা বৈদ্য-নাথের মাথায় সাড়ম্বরে ফুল-জল ঢালে, এমন লোকের বৈদ্যনাথ-পূজা কতখানি সার্থক হয় তা' বলার অপেক্ষা রাখে না। সদ্‌গুরুর আদেশ পালন ক'রে চলা ছাড়া মানুষ স্থিতধী হয় না, তার রিপুগুলিও বশে আসে না। ফলে, মাঙ্গল্য চলনে চলাও তার পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে ওঠে। আর, তাতে বৈদ্যনাথের পূজাও হয় না।

স্বর্গের নন্দনকাননে ফোটে পারিজাতফুল।

পুরাণে কথিত আছে, এ ফুল দুর্লভ। সবাই পেতে পারে না। পারিজাত পাওয়ার লোভ ও তার জন্য ছোটখাট সংগ্রামের কথা মহাভারত-পুরাণাদিতে লেখা আছে।

সত্যিই কি তেমন কোন নন্দনকানন কোথাও আছে যেখানে ফোটে সেই দুর্লভ পারিজাতফুল? শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের কাছে একথা ওঠায় তিনি বলেছিলেন, নন্দনকানন মানে আনন্দের স্থান। আবার নন্দ-এর মধ্যে আছে বর্দ্ধনা। তাই, যেখানে মানুষ স্বস্তির সাথে সপরিবেশ বৃদ্ধিমুখর হ'য়ে চলে তাই নন্দনকানন। আর, ঐ স্বস্তি ও বর্দ্ধনা কখন আসে? আসে বিহিত সুষ্ঠু সুবিনায়িত কর্ম্মসম্পাদনের ভিতর দিয়ে। যে যেমন কর্ম্ম করে, তেমনই সে ফল পায়। কর্ম্মসম্পাদনের জন্য চাই পারগতা অর্থাৎ পারার শক্তি। যে-কোন কাজেই অনেক বাধা-বিপত্তি থাকে, অনেক দিক বিচার ক'রে যথা-বিহিত সাবধানতা ও কৌশলসহ কাজে এগোতে হয়। তবে তা'তে সাফল্য লাভ হয়। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে, সাফল্যের জন্ম হয় পারগতার শক্তি থেকে। বিহিত সুক্রম পারগতাই মানুষকে পৌঁছে দেয় সার্থকতার শিখরে। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন, "পারগতা থেকে জাত ব'লে তার নাম পারিজাত"। তাহলে পারিজাতকুসুম আর কিছুই নয়, পারগতা থেকে জাত যে আনন্দময় সফলতা, এক কথায়, সুখসাফল্য। সেইজন্য পারি-

জাত-পুষ্পের উপর দেবগণের অত লোভ দেখা যায়। আর, ঐ কারণেই পারিজাত আহরণ করাটা বিশেষ কৌশল ও শ্রমসাধ্য ব্যাপার ব'লে পুরাণে বর্ণিত আছে।

দেবরাজ ইন্দ্রের শক্তিশালী অস্ত্র হল তাঁর বজ্র। এই বজ্রের আঘাতে ইন্দ্র বড় বড় অসুরকে নিপাতিত করেন। এই প্রসঙ্গে একদিন কথা হ'তে হ'তে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন, "ইন্দ্রের বজ্র মানে ইন্দ্রিয়ের বজ্র।" মানুষ যেমন কর্ম্ম করে, তার ইন্দ্রিয়-গ্রাম ও স্নায়ুরাজিও সেইভাবে উদ্দীপিত হয়।

ইন্দ্রিয়গুলির ব্যবহার যখন কুপথে হয় তখন তার কর্ম্মফল ফিরে আসে ধ্বংসাত্মক রূপ ধ'রে। ঐ কর্ম্মফলই মানুষকে নিকেশ করে। এই হ'ল ইন্দ্রের বজ্রের তাৎপর্য্য। ইন্দ্রের বজ্র দ্বারা যারা নিহত হয়েছে তাদের ইন্দ্রিয়াসক্ত কুক্রিয়াই তাদিগকে অমন পরিণতিতে নিয়ে ফেলেছে।

স্বর্গলোকে ইন্দ্রের রাজসভায় উর্ব্বশীর কথা শোনা যায়। নিত্যযৌবনা উর্ব্বশী সেখানে থাকেন। তিনি দেবরাজ ইন্দ্রের আজ্ঞাবহ। উর্ব্বশীর কাজের মধ্যে আমরা প্রধানতঃ দেখি, ইন্দ্রের সভায় নৃত্য-

গীতের দ্বারা দেবতাদের মনোরঞ্জন করা এবং মুনি-ঋষিদের ধ্যানভঙ্গ ক'রে তাঁদের মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করা। একদিন উর্ব্বশী সম্বন্ধে আলোচনা চলাকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন, "আমার মনে হয় উর্ব্বশী মানে উরু-বশী; উরু মানে মহৎ আর বশী মানে বশ করেন যিনি। তাহ'লে যিনি মহৎ ব্যক্তিদিগকে বশীভূত ক'রে ফেলতে পারেন, তিনিই উর্ব্বশী।" এই অর্থ নির্দ্ধারণ ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর উর্ব্বশীকে যেন সার্থকনামা করে তুললেন। আর, উর্ব্বশীর কাজও তাই। ছলা, কলা, কৌশলের ভিতর দিয়ে মহান ব্যক্তিদিগকে যে বশ করতে পারে, উর্ব্বশী সে-ই।

পুরাণে আছে দেবাসুরের সমুদ্রমন্থনের কাহিনী। দেবতা ও অসুর দুই প্রান্তে থেকে মন্দারপর্ব্বতকে মন্থনদণ্ড ও বাসুকী নাগকে মন্থনরজ্জু ক'রে সমুদ্র মন্থন করেছিল। সেই মন্থনের দরুন সমুদ্রের ভেতর থেকে উঠে এসেছিল অমৃত, গরল এবং আরো অনেক কিছু। এই ব্যাপারটি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে শ্রীশ্রী-ঠাকুর একদিন বলছিলেন, এটা সৃষ্টিতত্ত্বেরই একটা প্রতীক। দেবতা ও অসুর যেন দুই প্রান্তের দুই

বিপরীত শক্তি—পজিটিভ ও নেগেটিভ। এদের মধ্য-স্থলে অবস্থিত 'নিউট্রাল জোন', তা' যেন ঐ মন্দার-পর্বত। পজিটিভ ও নেগেটিভ-এর আকর্ষণ-বিকর্ষণ ও বিরমণের ভিতর দিয়ে সৃষ্টিধারার বিবর্তন সুরু হয়। মন্থন হ'ল ঐ আকর্ষণ-বিকর্ষণ। আর, এই আকর্ষণ ও বিকর্ষণের উভয় প্রান্তে আছে বিরমণ। পুরাণে উল্লিখিত আছে যে মন্থন যত হ'তে থাকল তত সমুদ্র থেকে উদগত হ'তে থাকল ঐরাবত, উচ্চৈঃশ্রবা, লক্ষ্মী, প্রভৃতি সৃষ্টির এক একটি বিশেষ একক। এই সমুদ্র হ'ল ভবসমুদ্র অর্থাৎ হওয়ার সমুদ্র। এই হওয়ার সমুদ্রে যা' কিছু হ'য়ে ওঠে অর্থাৎ গজিয়ে ওঠে—একটা আলোড়ন বা সঙ্ঘট্টনের মধ্য দিয়ে। এই আলোড়ন বা সঙ্ঘট্টনই মন্থন। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, যে-কোন সৃষ্টির প্রারম্ভেই রয়ে গেছে মাত্রামত মন্থন বা আলোড়ন-বিলোড়ন। এই মন্থন প্রথমে জাগে চিন্তায় ও ভাবজগতে, পরে তা' বাস্তবে রূপ নেয়। দেবাসুরের সমুদ্রমন্থন সৃষ্টির উদ্‌গতির সূচনারই প্রতীক।

ঠিক এমনই আর একটি প্রতীকের ব্যাখ্যা শ্রীশ্রীঠাকুর দিয়েছেন, তা' হ'ল শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা।

শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনায় আছে এক জ্যোৎস্নাপ্লাবিত শারদ রজনীতে প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র ক'রে গোপীগণ আনন্দে নৃত্য করছেন। এই নৃত্যলীলা যে শুধু আক্ষরিক অর্থে বিশেষ স্থানে, বিশেষ সময়ের জন্য, তা' নয়। এ নৃত্য চিরন্তন। একে বলা যায় জীবনের ছন্দায়িত চলন, যার তাল কখনও ভঙ্গ হয় না। অপর কথায়, এমন চলায় যে চলে তার কখনও বেতালে পা পড়ে না। বাস্তবেও তাই ঘটে। জীবন যখন ইষ্টগুরুর (এখানে শ্রীকৃষ্ণের) প্রতি অনুরাগবিদ্ধ হ'য়ে তাঁরই আদিষ্ট চলনে চলে, তখন আর ভ্রান্তি আসে না। রাসলীলা যেন তারই ইঙ্গিত। এর দ্বারা বোঝানো হচ্ছে, জীবকুল যদি এইভাবে পরমপুরুষকে কেন্দ্র ক'রে সুতাল চলনে চলে তবে আর দিগ্‌ভ্রান্ত হয় না।

এই কেন্দ্রায়িত আবর্তন আছে সৃষ্টির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পর্য্যায়ে একটি এ্যাটমের মধ্যেও। সেখানে একটি প্রোটনকে কেন্দ্র ক'রে চলেছে ইলেকট্রনের আবর্ত্তন। এই এ্যাটম দিয়েই দুনিয়ার প্রতিটি পদার্থ গঠিত। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর একদিন বলছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা যেন এ্যাটমের মধ্যেকার

নিত্য গতিশীলতারই অভিব্যক্তি। একটা এ্যাটমের কেন্দ্রায়িত আবর্ত্তন যেমন সেই এ্যাটমটাকে তাই ক'রে ধ'রে রাখে, বিশ্লিষ্ট হ'তে দেয় না, তেমনি জীবনকে সুসংস্থ ও সুসংবদ্ধ ক'রে রাখতে হ'লেও চাই পরমপুরুষের প্রতি অচ্যুত নিষ্ঠানন্দিত সুকেন্দ্রিক অনুচলন। এই চলনই জীবনকে সুসংগঠিত ক'রে ধ'রে রাখে। এই চলনেই জাগে ব্যক্তিত্ব, জীবন হয়ে আনন্দময়। সেই দিব্য চলনের দ্যোতকই হ'ল রাসলীলা।

শ্রীকৃষ্ণের লীলাকালের একটি বিশেষ অংশ কাটে বৃন্দাবনে। সেখানে তিনি বহু অসুর নিধন করেন এবং তাঁর শরণাগতদের অনেক আপদ-বিপদ থেকে রক্ষা করেন। এই বৃন্দাবন একটি স্থানের নাম। ভক্তগণ বলেন, শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনকে এত ভালবাসেন যে বৃন্দাবন পরিত্যাগ ক'রে তিনি কোথাও যেতে চান না (তুলনীয় ঃ 'বৃন্দাবনং পরিত্যাজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি')। কিন্তু বৃন্দাবনে বাল্যলীলার পরেও তো শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিস্তৃত হয়েছে মথুরায়, দ্বারকায়, হস্তিনাপুরে। তাহ'লে তাঁর কথা ও কাজে তো সঙ্গতি থাকে না।

এর সমাধান কী?

এ প্রশ্ন শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের কাছে উপস্থাপিত হওয়ায় অপূর্ব্ব এক ব্যাখ্যা দিলেন তিনি। অভিধানে দেখতে বললেন বৃন্দাবন-শব্দের অর্থ। দেখা গেল, বৃন্দাবন-এর মধ্যে দুটি শব্দ আছে—বৃন্দ ও অবন, যোগ ক'রে হয় বৃন্দাবন। বৃন্দ মানে সমূহ; সমূহ বলতে বিশ্বজগতের সব যা' কিছু। আর, অবন এসেছে অব্-ধাতু থেকে, মানে রক্ষা করা। তাহ'লে বৃন্দাবন মানে করা যায়—বিশ্বদুনিয়ার প্রতিপ্রত্যেকটি বস্তু বা ব্যক্তি যেখানে রক্ষিত হয়। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের নীতিবিধি হ'ল জীবনপালনী। ঐগুলি যারা পালন ক'রে চলে তারা এড়াতে পারে মৃত্যুভীতি, সহস্র আপদ-বিপদের মাঝেও তারা রক্ষা পায়। তাই, তাঁর অনুশাসনই হ'ল প্রকৃত বৃন্দাবন। তা' মেনে চললে সবাই রক্ষা পায়, জীবনবৃদ্ধিতে উচ্ছল হ'য়ে চলে।

তা' ছাড়া, বৃন্দাবন-শব্দের আরো একটি অর্থ নির্দ্ধারণ করেছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। সেটা ধাতুগত অর্থ। বৃণ্-ধাতু মানে প্রীত করা, আর 'দা' মানে দান করা। তাহ'লে বৃন্দা মানে দাঁড়াল যেখানে প্রীতির

আদান-প্রদান চলে, অর্থাৎ যেখানে মানুষ ভালবেসে ও ভালবাসা পেয়ে স্বস্তি-উৎফুল্ল থাকে। প্রীতিপূর্ণ পারস্পরিক সক্রিয় সেবা, দরদ ও সহানুভূতি নিয়ে যারা বসবাস করে তা'রা বৃন্দা। আর, বন-শব্দস্থিত বন্‌-ধাতুর মানে বিস্তার। তাহ'লে বৃন্দাবন মানে হ'ল 'প্রীতিকারী বিস্তার লাভ করে যেখানে'। মনে রাখতে হবে, প্রেম যার অন্তরে থাকে, তার চিত্ত উদার হয়, সর্ব্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতার বেড়া ভেঙ্গে তার প্রাণের প্রসার ঘটে। আর, প্রীতিসন্দীপ্ত এই প্রসারণাই 'বৃন্দাবন'। তাহ'লে আমরা বৃন্দাবন শব্দের দুটি অর্থ পাচ্ছি—একটি জীবন-সংরক্ষণী নীতিবিধি, অপরটি হ'ল প্রীতিপ্রেমের আবাসভূমি। এই দুটিই ঈশ্বরের অভিপ্রেত। পরমপুরুষ, যিনি নরদেহে ঈশ্বরের জীয়ন্ত বেদী, তিনি মানুষকে এই দুটি বিষয়কে আশ্রয় ক'রে জীবনপথে চলতে প্রবুদ্ধ করেন। তাঁর ইচ্ছা—মানুষ যেন প্রীতিসংহতি নিয়ে সাত্বত চলনে চলংশীল থেকে সপারিপার্শ্বিক উদ্বর্দ্ধনার পথে এগিয়ে যায়। তাই, এই চলনই পরমপুরুষের বৃন্দাবন। তিনি অচ্যুত। সত্তাসংরক্ষী প্রেমসঞ্চারী এই চলনে তিনি নিত্য অধিষ্ঠিত।

এই-ই তাঁর নিত্য বৃন্দাবন এবং এই বৃন্দাবন ত্যাগ ক'রে তিনি এক পা-ও কোথাও যান না। এই অর্থ থেকে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না কেন তাঁর উক্তি—'বৃন্দাবনং পরিত্যাজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি'।

পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বদুনিয়ার পালক এবং রক্ষাকর্তা। তাঁকে শরণ ক'রে চললে মানুষ অমঙ্গল থেকে রক্ষা পায়, দুর্দ্দৈবের প্রবল কশাঘাতও তাকে বিপর্য্যস্ত করতে পারে না। গীতাতে শ্রীভগবান স্বয়ং সে প্রতিশ্রুতি বার বার দিয়েছেন। কিন্তু একটা কথা আমাদের দেশে খুব চালু আছে—'যে আমার করে আশ, তার করি সর্ব্বনাশ', অর্থাৎ যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয়, তিনি তার সর্ব্বনাশ করেন। পরে কী হয় না হয় সে পরের কথা। কিন্তু বিশ্বের রক্ষক যিনি তাঁকে গ্রহণ করলে যদি সর্ব্বনাশ হয় তবে কে আর তাঁকে চাইবে? যাকে ভালবাসলে সর্ব্বনাশ হবে, তার থেকে দূরে থাকাই তো উচিত। সেইজন্য দয়াল ঠাকুর শ্রীঅনুকূলচন্দ্র ওই মতবাদ সমর্থনই করেন নি। তিনি ঐ ছড়াটাকে এভাবে বলেছেন, 'যে আমার করে আশ, তার কাটে

বৃত্তিফাঁস'। অর্থাৎ পরমপিতার শরণাগত হ'য়ে চললে মানুষ বৃত্তির বন্ধন কাটাতে পারে। প্রবৃত্তির মোহে তাকে আর আবদ্ধ হ'য়ে থাকতে হয় না। আর, প্রবৃত্তি বন্ধন থেকে যে মুক্ত, সেই হয় প্রকৃত সুখী, সে-ই হয় যথার্থ মুক্তপুরুষ।

আর, তার জন্য চাই গুরু-পুরুষোত্তমে ঐকান্তিক অনুগতি। বলাবাহুল্য, এই চিন্তাধারা একেবারে নতুন। এতকালের প্রচলিত ভাবনার স্রোতকে একেবারে নতুন বিশেষ একটি খাতে বইয়ে দিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর।

বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের লীলাসঙ্গিনী শ্রীরাধিকা, একথা সুবিদিত। এই রাধা সম্পর্কে কত কথা পাওয়া যায় বৈষ্ণবভক্তদের লেখার মধ্যে—রাধার শ্বশুরালয়ের কথা, রাধার অনুরাগ, অভিমান, বিরহাদির কথা, তাঁর অচ্যুত কৃষ্ণভক্তির কথা ইত্যাদি। রাধাকে নিয়ে অনেক তত্ত্বেরও অবতারণা হয়েছে, বলা হয়েছে রাধা হচ্ছেন হ্লাদিনী শক্তি। ওদিকে আবার মজার কথা এই যে শ্রীকৃষ্ণের প্রামাণ্য জীবনকাহিনী ব'লে যে গ্রন্থগুলির উল্লেখ করা হয়—মহাভারত, ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ ও হরিবংশ—এই

চারখানির মধ্যে কোথাও রাধার নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ নেই। তাহ'লে? রাধা কি শুধু কল্পনা?

না। শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন, রাধা কল্পনা নয়। রাধার বাস্তব অস্তিত্ব আমরা বোধ করতে পারি যদি তার ধাতুগত অর্থের উপর দাঁড়াই। রাধা-শব্দস্থিত রাধ্-ধাতুর অর্থ নিষ্পাদন করা। তাই, রাধা হ'ল নিষ্পাদনী সম্বেগ, কর্ম্মসম্পাদনী শক্তি। এটা একটা 'এনার্জি' যা' প্রতিটি কর্ম্মের পশ্চাতেই বিরাজমান। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নরলীলায় যে সব কর্ম্ম-সম্পাদন করেছেন তার পশ্চাতে যে আকূতি বিদ্যমান, তাই হচ্ছে রাধা। তাই, শুধু বৃন্দাবনেই নয়, দ্বারকালীলাতেও নারদাদি ভক্তসঙ্গে রাধা-নাম উচ্চারিত হ'তে দেখা যায়। রাধা হ'ল দ্বাপরের বীজনাম, মহাশক্তি। আর নাম এবং নামী অভেদ। তাই, রাধার সাথে কৃষ্ণের নিত্যসম্বন্ধ।

রাধা হ'লেন শক্তি। শক্তিকে কল্পনা করা হয়েছে নারীরূপা ব'লে। ভক্তগণ এই শক্তিকে শুধু শক্তিরূপেই থাকতে দেন নি। তাতে ব্যক্তিত্ব অরোপ ক'রে তাকে একটি মহীয়সী স্ত্রীলোক ক'রে তুলেছেন। আর স্ত্রীলোক হ'লেই তার যে যে গুণবৈশিষ্ট্য ও

লক্ষণ থাকা দরকার, সবই আরোপিত হয়েছে শ্রীরাধাতে। এই রূপেই আমরা শ্রীরাধিকাকে দেখতে পাই কবির লেখনীতে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পুরীধামে জগন্নাথদেবরূপে প্রকট। সাথে আছেন বলরাম ও সুভদ্রা। ঐ রূপে দেখা যাচ্ছে, জগন্নাথের হাত নেই। এটা কেমন ব্যাপার? জগতের নাথ যিনি তাঁর একখানাও হাত নেই? এর তাৎপর্য্য কী? ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন শ্রীশ্রীঠাকুর—'জগন্নাথের হাত নেই মানে তিনি কাউকে ধরেন না, তাঁকে ধরতে হয়।' শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন, কৃপা মানে করে পাওয়া। জগন্নাথ যিনি, ঈশ্বর যিনি, তিনি বিধি। তাঁকে ধরলে, তাঁর আদেশ পালন ক'রে চললে মানুষ ত্রিতাপজ্বালা এড়াতে সক্ষম হয়। সাধারণতঃ আমরা বুঝি, ভগবান আমাদের দয়া করেন, তিনি অন্ধকারের মাঝে হাত ধ'রে নিয়ে যান। কিন্তু এই ধারণাটা বিধির বিধান-অনুযায়ী ঠিক নয়। শ্রীশ্রীঠাকুর জানিয়ে দিলেন, জগন্নাথের হাত না-থাকা মানে ধরা ও করার দায়িত্ব তাঁর নয়, মানুষের। জগন্নাথ পরোক্ষে বলছেন, তোমরা আমাকে ধর। মানুষ

যদি তাঁকে ধরে, জীবনে গ্রহণ করে, তাঁর অনুশাসন মেনে চলে, তখনই সে তাঁর আশীর্ব্বাদ লাভের অধিকারী হয়।

এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের আর একটি বিশেষ সিদ্ধান্ত আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না মনে হয়। অনেকে বলেন, ভগবান দয়া করেন, কারণ তিনি অহেতুক কৃপাসিন্ধু। তিনি যখন কৃপা করেন তখনই মানুষ পথ পায়, বিপদ থেকে উদ্ধার পায়। তাঁর কৃপা ছাড়া কিছু হয় না। এখানে শ্রীশ্রীঠাকুর এনেছেন এক বিপ্লবাত্মক সিদ্ধান্ত। তিনি বললেন, জগতে হেতু ছাড়া কিছুই হয় না। কৃপা যখন তুমি পাচ্ছ তখন সে-পাওয়ার পিছনে হেতু অবশ্যই আছে—তা' তুমি বুঝতে পার বা না পার। তারপর আরও বলেছেন, যদি অহৈতুকী কৃপা পেয়েছ বল, তাহ'লে জেনে রেখো তার পিছনে অহৈতুকী ভক্তি আছেই। অহৈতুকী ভক্তি ছাড়া অহৈতুকী কৃপা মেলে না।

জগন্নাথদেব হস্তবিহীন হ'য়ে এই সত্যই প্রকাশ করছেন যে তুমি তাঁকে ধর, ভালবাস, তাঁর প্রীতির জন্য কর্ম্ম কর। প্রতিটি মানুষের কাছে ঈশ্বরের

এইই প্রত্যাশা।

জগন্নাথের পাশে আছেন বলরাম। তিনি শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, মহাপরাক্রমী, বলশালী, যুদ্ধ-বিদ্যায় পারদর্শী। কিন্তু সাধারণতঃ, বলরামের যে চিত্রটি পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় তাঁর স্কন্ধে হল (লাঙ্গল)। বহু বর্ণনাতেই এটা পাওয়া যায়। বলরামের সবসময় লাঙ্গল কাঁধে ক'রে ঘুরে বেড়াবার তাৎপর্য্য কী! তাহ'লে কি তিনি যুদ্ধও করতেন লাঙ্গল দিয়ে? ব্যাখ্যা পেলাম শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে। তিনি বললেন, বলরাম ছিলেন বড় একজন কৃষি-বিজ্ঞানী, কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে তখনকার দিনের একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তাঁর এই বিশেষ গুণের প্রতীক হিসাবে আমরা বলরামের স্কন্ধে হল দেখতে পাই।

শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত নারদ। নারদ মুনি সম্পর্কে কত আখ্যান আছে ভক্তিগ্রন্থাদিতে। তাঁর সহজভক্তিযুক্ত কূটকৌশলী তথা তেজোদ্দীপ্ত চরিত্রের বর্ণনাও অনেক পাওয়া যায়। যুগপুরুষ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র নারদ সম্বন্ধে করলেন একটি নতুন আলোকপাত। বললেন, "আমার মনে হয় না-কে রদ (নিরুদ্ধ) করেন যিনি, তিনি নারদ।"

আমাদের চলার পথে বহুরকমের 'না' আছে। সেটা কোন সময়ে অবিশ্বাসের রূপ ধ'রে এসে দাঁড়ায়, কখনও দাঁড়ায় সন্দেহের ছদ্মবেশে, কখনও দেখা যায় চিত্তের দোদুল্যমান অবস্থায়। না-এর এই প্রকৃতিগুলিই কর্ম্মসম্পাদনের পথে, জীবনের অগ্রগতির পথে বাধাস্বরূপ। না-এর বশীভূত যে যত, যে জীবনযুদ্ধে তত পরাজিত, ব্যক্তিত্বও তার তত দৈন্যভারাক্রান্ত এবং নির্জীব। জীবনকে জ্ঞানে, কর্ম্মে, বোধে, ভক্তিতে উজ্জ্বল ক'রে তুলতে হ'লে না-বোধক যা' কিছু তাকে রুদ্ধ করতে হবে। আর, নারদ নামের তাৎপর্য্যই তাই।

এই মহাসত্যকে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর কথায় নানা-ভাবে তুলে ধরেছেন। ছড়ায় বলেছেন—

'না' সুন্দরী বধূ যা'র
'হয় না' যা'র শালা,
অলক্ষী তা'র ঘরে গিয়ে
সব করেছে কালা।

আবার, কথাচ্ছলে কতদিন বলেছেন, আমার কর্ত্তামা বলতেন—

'হয় না, পারি না, নেইকো ঘরে
এ তিন কথায় দেবতা হারে।'

অর্থাৎ হয় না, পারি না, ঘরে নেই, কথায়-কথায় এরকম বলা যদি অভ্যাস থাকে, সেখানে দেবতাও বিপর্য্যস্ত হন। তাই, জীবনকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যেতে হ'লে না-বোধক চিন্তাকে হাঁ-বোধক-এ রূপান্তরিত করতে হবে। নারদ নামের তাৎপর্য্যই তাই। আর, সেইজন্যই ভক্তিজগতে নারদের এত প্রাধান্য।

এক এক দেবতার এক একরকম বাহন। কিন্তু নারদের বাহনটি বড় বিচিত্র, সেটা একটা ঢেঁকি। ঢেঁকিতে চ'ড়েই তিনি এদেশ-সেদেশে যাতায়াত করতেন। এমনকি, ঢেঁকিবাহন হ'য়ে তিনি অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রেও যেতেন ব'লে উল্লেখ আছে। বাস্তবে এই ঢেঁকিটা কী?

পরমদয়াল শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন, ওটা একরকম রকেট, যার সাহায্যে দ্রুত আকাশপথে যাতায়াত করা যেত। প্রশ্ন উঠতে পারে, তখনকার দিনের বিজ্ঞান কি রকেট তৈরি করার মত উন্নত ছিল? তখনকার বিজ্ঞান যে অনেক উন্নত ছিল তা' রামায়ণ-মহাভারতের বিভিন্ন ঘটনা থেকেই জানা যায়। রাবণের পুষ্পকরথ নামক আকাশযান, শ্রীরামচন্দ্রের

সমুদ্রের উপরে সেতুবন্ধন, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে নানারকম মারণাস্ত্রের প্রয়োগ ইত্যাদি ব্যাপার তৎকালীন ভৌতবিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উৎকর্ষই সূচনা করে। তারই একটা উদাহরণ আমরা পাই নারদের বাহনের মধ্যে।

শ্রীকৃষ্ণের আর এক নাম শ্রীহরি। তাঁকে হরি বলা হয় কেন? কথিত আছে, তিনি পাপ-তাপ হরণ করেন, তাই হরি নামে আখ্যাত। এখানেও শ্রীশ্রীঠাকুরের বড় সুন্দর ব্যাখ্যা আছে। তিনি বলছেন, "ত্রিতাপজ্বালা হরণ করেন ব'লে তিনি হরি। তাছাড়া, মনের প্রবৃত্তিমুখী ভাব তিনি হরণ করেন, ক'রে তাকে সত্তামুখী ক'রে তোলেন। আর, সকল অবতারপুরুষই তাই করেন। তাঁতে অনুরক্ত হ'য়ে তাঁর আদেশ পালন ক'রে চললে মানুষ প্রবৃত্তি-ভার থেকে মুক্ত হয়। সেই অর্থে সব অবতারপুরুষই হরি।"

গোলোকে শ্রীহরি বিষ্ণু নামে অভিহিত। কাহিনী আছে, নিদ্রিত বিষ্ণু-বক্ষে ভৃগুমুনি পদাঘাত করেন। বিষ্ণু ক্রুদ্ধ না হ'য়ে ভৃগুমুনির পদসেবা করতে থাকেন। ঐ ভৃগুপদচিহ্ন বিষ্ণুবক্ষে অঙ্কিত

হ'য়ে আছে। স্বাভাবিকভাবে এখানে ধাঁধা লাগে যে যিনি জগৎপাতা তিনি একজন মুনির পদচিহ্ন বক্ষে ধারণ করছেন কেন? আবার, একজন মুনি তিনি যতই শ্রেষ্ঠ হন, বিষ্ণুবক্ষে পদাঘাত করছেন? এই বা কেমন কথা? এর সামঞ্জস্য কোথায়? বহুপ্রচলিত এই কাহিনীটির তাৎপর্য্য বড় চমৎকার ক'রে উদ্‌ঘাটন করেছেন শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র। বলেছেন তিনি, বিষ্ণু বিশ্বের পালনকর্তা, নারায়ণ— মানুষের বর্দ্ধনার পথ। তাঁর বিধানই একমাত্র মঙ্গলপ্রসূ। মানুষ যদি সেই বিধান-অনুযায়ী চলে তাহ'লে তার সত্তা পরিপালিত ও পরিপোষিত হয়। আর সত্তাপথে চলা অর্থাৎ বেঁচে থাকা ও বেড়ে চলাই শ্রেষ্ঠ সম্পদ। কারণ, অস্তিত্ব যদি বজায় না থাকে এবং তার কোন জেল্লা না থাকে, তবে তো সবকিছুই নিরর্থক হ'য়ে যায়। এদিকে ভৃগু কথার মানেও শ্রেষ্ঠ; আর পদ মানে গতি, চলন। ভৃগুপদ মানে তাহলে শ্রেষ্ঠ চলন। সেই শ্রেষ্ঠ চলন হ'ল জীবন ও বর্দ্ধনের সর্বতোমুখী উচ্ছলতা। আর, তা' তো বিষ্ণুবক্ষে নিত্যই বিরাজমান। বিষ্ণু যিনি, পরমপাতা যিনি তিনিই তো সৎ, শ্রেষ্ঠ ও শুভ যা'

কিছু তার একমাত্র উৎস। আর, তাই হ'ল বিষ্ণু-বক্ষে ভৃগুপদ।

এইভাবে পৌরাণিক প্রহেলিকাগুলি একে একে ভেদ ক'রে দয়ামর শ্রীশ্রীঠাকুর সবকিছু দিনের আলোর মত পরিষ্কার ক'রে দিয়েছেন। এর ফলে, দেবতা বা তৎসংশ্লিস্ট আখ্যান কেউ স্বীকার করুক বা না করুক, তাঁদের সম্বন্ধে একটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি লোকসমক্ষে উপস্থাপিত হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই।

—※—